182. Mc. 920. 7
182. Mc. 910. 12 (3)
75

সুদৃশ্য

182. Mc. 910. 12 (3).

বা

বঙ্গের রত্নমালা, তৃতীয় ভাগ।

BENGAL LIB
10 JAN 192
BUILDIN

বিদ্যাসাগর কলেজের প্রধান সংস্কৃতাধ্যাপক
পণ্ডিত শ্রীকালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য
প্রণীত।

PUPLISHED BY
S. C. SANYAL,
AT

S. C. SANIAL & Co.
Oriental Booksellers & Publishers :
31-2, FIRST FLOOR, COLLEGE STREET MARKET.
CALCUTTA.
1920.

মূল্য ১৲

সূচিপত্র।

বিষয়	পত্রাঙ্ক
ভূমিকা	১
দৃশ্য প্রথম—বৰ্দ্ধমান-জলপ্লাবন	৪
দৃশ্য দ্বিতীয়—মাতৃমূর্ত্তি	৮
দৃশ্য তৃতীয়— বীরত্ব	১০
দৃশ্য চতুর্থ—পরের বিপদে আত্মবিপদ্	১৩
দৃশ্য পঞ্চম—কুলকামিনীকে রক্ষা	১৬
দৃশ্য ষষ্ঠ—পরবিপদে প্রাণদানে	২০
দৃশ্য সপ্তম—আকাকাহিনী	২৩
দৃশ্য অষ্টম—জিতনেত্রতা ও পিতামহীর সেবা ...	২৮
দৃশ্য নবম—গোবৎস রক্ষা ও কন্থকা রক্ষা ✓ ...	৩৩
দৃশ্য দশম—অবমানে অগণনা	৪০
দৃশ্য একাদশ—বিমাতা	৪৪
দৃশ্য দ্বাদশ—আতুরের সেবা...	৪৮
দৃশ্য ত্রয়োদশ—পিতৃদর্শন	৫০
দৃশ্য চতুর্দ্দশ—বাল্যকালের কয়েকটী চিত্র	৫৫
দৃশ্য পঞ্চদশ—প্রভুর প্রতি অনুরাগ	৬২
দৃশ্য ষোড়শ—লোকোপহাসে ঔদাসীন্য	৬৯

দৃশ্য সপ্তদশ—মিত্রতা (১ম অংশ) ৭২

„ (২য় অংশ) ৭৬

দৃশ্য অষ্টাদশ—পিতাপুত্রের সম্বন্ধ স্থাপন ৭৯

দৃশ্য ঊনবিংশ—সত্যই ঈশ্বর ৮২

কয়েকটী ক্ষুদ্র অথচ মনোরম দৃশ্য ... ৮৬

দৃশ্য বিংশ—গুরুগৃহ-চিত্র ৯১

দৃশ্য একবিংশ—আতিথেয়তা ৯৬

দৃশ্য দ্বাবিংশ—শোণিতদান... ... ... ১০৩

দৃশ্য ত্রয়োবিংশ—স্বধর্ম্মে প্রকৃত বিশ্বাস ও কয়েকটী বঙ্গীয় ললনার চিত্র ১০৬

দৃশ্য চতুর্ব্বিংশ—একাধারে কয়েকটী সুদৃশ্য ... ১১৪

দৃশ্য পঞ্চবিংশ—জ্যেষ্ঠানুরাগ ১১৮

দৃশ্য ষড়্‌বিংশ—চরিত্রবানের নির্ভীকতা ও বিপৎকালে ধৈর্য্য ১২০

দৃশ্য সপ্তবিংশ—পরোপকারে আত্মবিস্মৃতি ... ১২৬

দৃশ্য অষ্টাবিংশ—সন্তোষে লাভজ্ঞান ১২৬

~~182. Mc. 920.7~~ 182. Mc. 910. 12(13)
75
182. Mc. 910. 12(3).

সুদৃশ্য

বা

বঙ্গের রত্নমালা, তৃতীয় ভাগ।

BENGAL LIB...
10 JAN 192..

বিদ্যাসাগর কলেজের প্রধান সংস্কৃতাধ্যাপক
পণ্ডিত শ্রীকালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য
প্রণীত।

PUPLISHED BY
S. C. SANYAL,
AT

S. C. SANIAL & Co.
Oriental Booksellers & Publishers :
31-2, FIRST FLOOR, COLLEGE STREET MARKET.
CALCUTTA.
1920.

মূল্য ১৲

IMPERIAL LIBRARY
4 DEC. 22

PRINTED BY K. C. NEOGI,
NABABIBHAKAR PRESS.
91-2, Machuabazar Street, Calcutta.

উৎসর্গ-পত্র।

পরমারাধ্যা প্রত্যক্ষ দেবতা স্নেহময়ী জননী
স্বর্গতা মনোমোহিনী দেবী

শ্রীচরণ-কমলেষু

মা,

সন্তানের চক্ষে মায়ের ন্যায় সুদৃশ্য বস্তু জগতে আর নাই। সন্তান মায়ের বাহ্যরূপ দেখিতে পায় না, সে অন্তশ্চক্ষু দ্বারা মায়ের যে স্বর্গীয়রূপ আছে, তাহাই দিবারাত্র দেখিতে পায়। সেই জন্যই মা সুশ্রী কি কুৎসিত তাহা অন্যে বাহ্যচক্ষুতে দেখে বটে, কিন্তু সন্তান তাহা দেখিতে পায় না। মা আমার সুন্দরী, কি, মা আমার কুৎসিত, ইহা কোন ছেলের মুখেই শুনিতে পাওয়া যায় না। সন্তানের মা-দেখা চক্ষু আলাদা। অন্তশ্চক্ষু দ্বারা যত সুদৃশ্য বস্তু দেখিতে পাওয়া যায়, মা তাহাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। মা, তুমি আমার চক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা সুদৃশ্য বলিয়া এই "সুদৃশ্য" নামক পুস্তকখানি তোমারই শ্রীকরকমলে অর্পণ করিলাম। আমার প্রদত্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপহার লাভে যে স্বর্গের হাসি হাসিতে, সেইরূপ মনোমুগ্ধকর স্মিত-হাস্যে আমার এই ক্ষুদ্র উপহারটী গ্রহণ কর। আমার মঙ্গলের জন্য তুমি, যে বক্ষঃস্থল চিরিয়া দেবতাকে বহুবার রক্ত দিয়াছ, সেই ক্ষতচিহ্নিত বক্ষঃ ও স্বর্গের হাসিমাখা মুখের নিকট সমস্ত সুদৃশ্যকে হার মানিতে হয়।

প্রণত সেবক—
শ্রীকালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।

বিজ্ঞাপন।

বরিশালের অশ্বিনী বাবু বঙ্গের রত্নমালা দ্বিতীয় ভাগ উপহার পাইয়া বলিয়া পাঠান, "আরও চাই, আরও।" তাঁহার এই অনুরোধ এতদিনেও ভুলিতে পারি নাই। তাঁহাদের ন্যায় মহাপুরুষদিগের অনুরোধ যে রক্ষা হইল, ইহাতে মনে আনন্দ ধরিতেছে না। বঙ্গের রত্নমালা তৃতীয় ভাগে সমস্ত ঘটনাই সুদৃশ্য হওয়াতে ইহার নাম করণ "সুদৃশ্য" হইল। এক্ষণে পাঠকদিগের নয়নে সুদৃশ্য হইলেই সমস্ত শ্রম সফল বোধ হইবে।

গ্রন্থকারস্য

সূচিপত্র।

বিষয়	পত্রাঙ্ক
ভূমিকা	১
দৃশ্য প্রথম—বর্দ্ধমান-জলপ্লাবন	৪
দৃশ্য দ্বিতীয়—মাতৃমূর্ত্তি	৮
দৃশ্য তৃতীয়—বীরত্ব	১০
দৃশ্য চতুর্থ—পরের বিপদে আত্মবিপদ্	১৩
দৃশ্য পঞ্চম—কুলকামিনীকে রক্ষা	১৬
দৃশ্য ষষ্ঠ—পরবিপদে প্রাণদানে	২০
দৃশ্য সপ্তম—আকাকাহিনী	২৩
দৃশ্য অষ্টম—জিতনেত্রতা ও পিতামহীর সেবা	২৮
দৃশ্য নবম—গোবৎস রক্ষা ও কন্যকা রক্ষা	৩৩
দৃশ্য দশম—অবমানে অগণনা	৪০
দৃশ্য একাদশ—বিমাতা	৪৪
দৃশ্য দ্বাদশ—আতুরের সেবা	৪৮
দৃশ্য ত্রয়োদশ—পিতৃদর্শন	৫০
দৃশ্য চতুর্দ্দশ—বাল্যকালের কয়েকটী চিত্র	৫৫
দৃশ্য পঞ্চদশ—প্রভুর প্রতি অনুরাগ	৬২
দৃশ্য ষোড়শ—লোকোপহাসে ঔদাসীন্য	৬৯

দৃশ্য সপ্তদশ—মিত্রতা (১ম অংশ) ৭২
„ (২য় অংশ) ৭৬
দৃশ্য অষ্টাদশ—পিতাপুত্রের সম্বন্ধ স্থাপন ৭৯
দৃশ্য ঊনবিংশ—সত্যই ঈশ্বর ৮২
কয়েকটী ক্ষুদ্র অথচ মনোরম দৃশ্য ... ৮৬
দৃশ্য বিংশ—গুরুগৃহ-চিত্র ৯১
দৃশ্য একবিংশ—আতিথেয়তা ৯৬
দৃশ্য দ্বাবিংশ—শোণিতদান... ... ... ১০৩
দৃশ্য ত্রয়োবিংশ—স্বধর্ম্মে প্রকৃত বিশ্বাস ও কয়েকটী বঙ্গীয় ললনার চিত্র ১০৬
দৃশ্য চতুর্ব্বিংশ—একাধারে কয়েকটী সুদৃশ্য ... ১১৪
দৃশ্য পঞ্চবিংশ—জ্যেষ্ঠানুরাগ ১১৮
দৃশ্য ষড়্‌বিংশ—চরিত্রবানের নির্ভীকতা ও বিপৎকালে ধৈর্য্য ১২০
দৃশ্য সপ্তবিংশ—পরোপকারে আত্মবিস্মৃতি ... ১২৬
দৃশ্য অষ্টাবিংশ—সন্তোষে লাভজ্ঞান ১২৬

সুদৃশ্য

বা

বঙ্গের রত্নমালা, তৃতীয় ভাগ।

ভগবান্ কৃপা করিয়া মনুষ্যকে কতই দিয়াছেন! এক দিকে যেমন দেহের সৌন্দর্য্য দিয়াছেন, অন্যদিকে সেইরূপ মনের সৌন্দর্য্য বিধান করিয়া মনুষ্যকে এক অপূর্ব্ব বস্তু সৃষ্টি করিয়া-

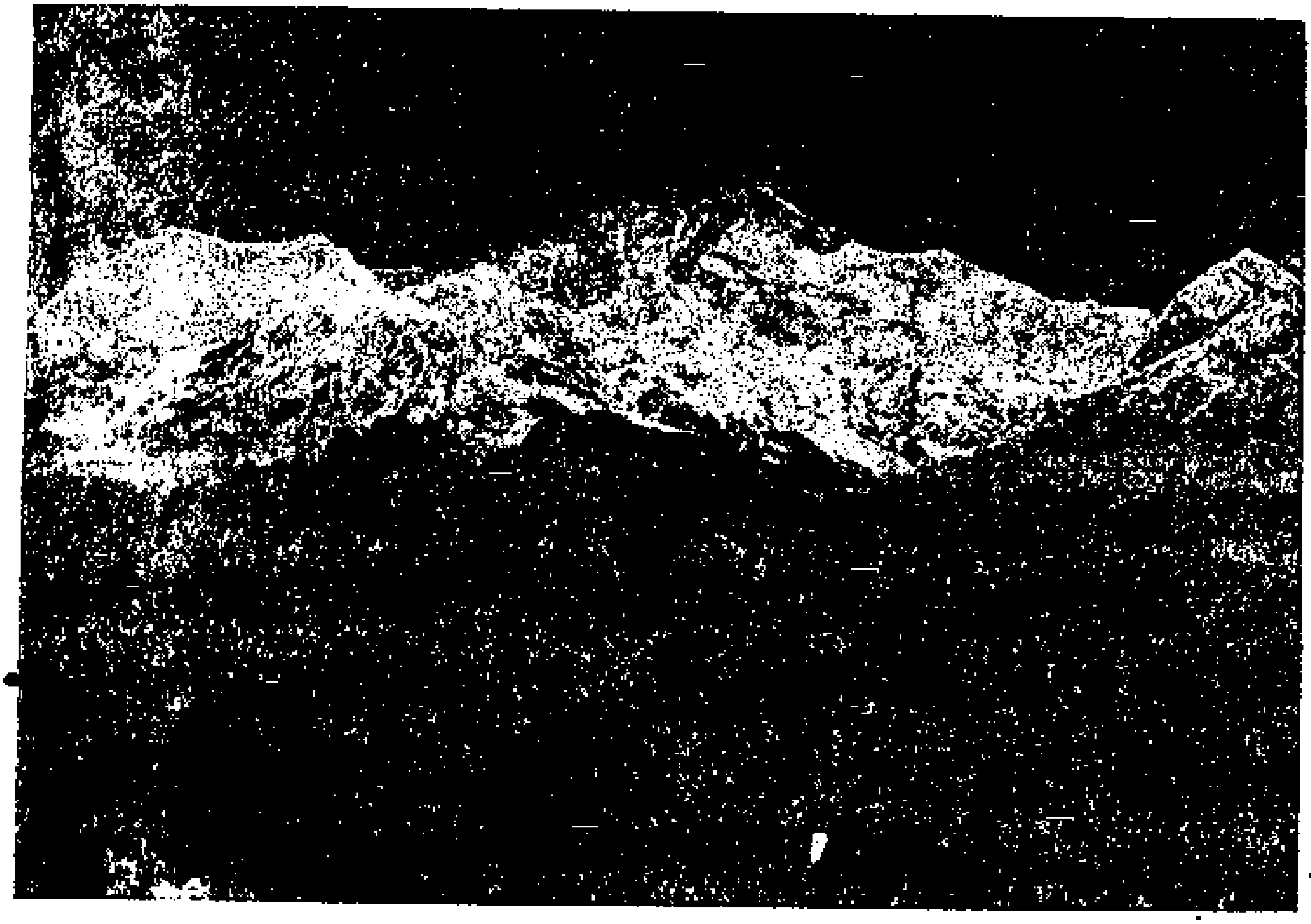

কাঞ্চন জঙ্ঘা।

ছেন। জ্ঞান দয়া ধর্ম্ম প্রভৃতি সদ্‌গুণে বিভূষিত করিয়া কেবল যে তাহার ভোগ করিবার শক্তি দিয়াছেন তাহা নহে, এই সকল গুণের চিত্র দেখিয়া তাহাতে মুগ্ধ হইবার ক্ষমতা দিয়া তাহাকে দিব্য পুরুষের মধ্যে গণনীয় করিবার সুবিধা দিয়াছেন।

সুদৃশ্য দেখিয়া বিমোহিত হইতে কেবল মনুষ্যই পারে। যিনি হিমালয় পর্ব্বত দেখিয়াছেন, কাঞ্চনজঙ্ঘার অপরূপ মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তিনিই জানিয়াছেন সুদৃশ্যদর্শনে মানুষ কিরূপ মুগ্ধ হয়। একটী পাহাড়ের উপর আর একটী পাহাড়, তাহার উপর অপর একটী পাহাড় মস্তক তুলিয়া যে দৃশ্য দেখায়, অগণ্য পাহাড়ের মাঝে মধ্যে মধ্যে মেঘরাজি সংলগ্ন থাকিয়া যে শোভা বিস্তার করে, তাহা দেখিয়া মানুষই বিমোহিত হয়, মনুষ্যব্যতীত প্রায় সমস্ত প্রাণী তাহা দেখিতেও জানে না, তাহা অনুভব করিতেও পারে না। কিন্তু মানুষ এই দৃশ্য যতই দেখে, ততই সে নির্নিমেষ হইয়া পড়ে, ততই সে অবাক্ হয়, ততই সে আত্মহারা হইয়া যায়।

যিনি জাহাজে সমুদ্রবক্ষে ভাসিয়াছেন, তিনি বিশালতা কি তাহা অনুভব করিতে শিখিয়াছেন। তিনি যে দিকে চান, কেবল বিশালতাই প্রত্যক্ষ করেন। আকাশ পানে তাকাইয়া আকাশের বিশালতা দেখেন, সমুদ্রের দিকে তাকাইয়া জলধির অসীমতা দৃষ্টিগোচর করিয়া মুগ্ধ হন। যেদিকে তাকান, সেইদিকেই বিশালতার ছবি। এ ছবি দেখিতে মনুষ্যই জানে, মনুষ্যই অনুভব করে, মনুষ্যই আত্মহারা হইয়া পড়ে। জাহাজে মনুষ্য বহু জন্তু সঙ্গে লয়, সেই সকল জন্তু সমুদ্রও দেখে, আকাশও দেখে,

কিন্তু তাহার বিশালতা প্রত্যক্ষ করিবার ক্ষমতা ধরে না, সেই বিশালতা কিরূপ মনোমোহনকারিণী তাহা অনুভব করিবার শক্তি না থাকাতে তাহাদের এদৃশ্য দেখা না দেখা উভয়ই তুল্য হয়। কিন্তু মানুষ যখন একবার উপরে দৃষ্টিক্ষেপ করে, একবার নিম্নে তাকাইয়া দেখে, তখন সে একেবারেই বিমুগ্ধ, সে একেবারেই নির্ব্বাক্। বিশালতার ভাব তাহার চিত্তকে অধিকার করিয়া বসে। সে আর স্থির থাকিতে পারে না, সে হস্ত দুইখানি যোড় করিয়া "ভবায় জলমূর্ত্তয়ে নমঃ" "ভীমায় আকাশমূর্ত্তয়ে নমঃ" বলিতে বলিতে ভগবচ্চরণে মস্তক বার বার অবনত করিতে থাকে, ঈশ্বরের ভূমার পরিচয় কিয়দংশ পাইয়া আত্মাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিতে থাকে, মনের এক অদ্ভুত অবস্থায় অবস্থান করিয়া নিমীলিত লোচনে ভগবানের সত্তা অনুভব করিতে থাকে।

বসন্তের নানারঙ্গের সুবাসিত কুসুমদামে সুশোভিত অরণ্য-মধ্যে যখন ভৃঙ্গগণ গুঞ্জন করিতে করিতে নানা পুষ্পে বিচরণ করিতে থাকে, ফুলের মধুপানান্তে ফুলশয্যাতেই বিশ্রাম লাভ করিতে থাকে; কোকিলগণ সুস্বর বাহির করিয়া দিঙ্মণ্ডল মুখরিত করিতে থাকে; বৃক্ষগণ নূতন সজ্জায় সজ্জিত হইয়া বাহু বিস্তার করিয়া নাচিতে থাকে; সে দৃশ্য দেখিবার শক্তি কাহার? সে দৃশ্য দেখিয়া আনন্দে বিভোর হওয়া কাহার ক্ষমতা-মধ্যে আছে? কেবল মানুষই এ দৃশ্য দেখিতে পায়, কেবল মানুষ এই দৃশ্য দেখিয়া তন্ময় হয় এবং যাঁহার রচিত এ দৃশ্য, তাঁহার প্রতি ভক্তিতে গদ্‌গদ হইয়া আত্মাকে চরিতার্থ করিতে কেবল মানুষই পারে।

শরদের নির্ম্মল গগনে যখন সমুদায় নক্ষত্র ফুটিয়া উঠে, নূতন শশিকলা একটী উজ্জ্বল নক্ষত্রের নিকট থাকিয়া চন্দ্র-বিন্দুর আকার ধারণ করিয়া চারুচন্দ্রাবতংস মহাদেবের মূর্ত্তির কিঞ্চিৎ আভাস দেখাইতে থাকে, চকোরগণ নির্ম্মল জ্যোৎস্নায় অবগাহন করিয়া আনন্দে আকাশমধ্যে ক্রীড়া করিতে থাকে, পক্ষিগণকে মূক দেখিয়া যেন বিরক্ত হইয়াই ঝিল্লীগণ তীব্ররবে জগৎপাতার স্তুতিগান করিতে থাকে, তখন মানুষভিন্ন অন্য কোন জীব সে দৃশ্য দেখিতে পায় না, ও তদ্দর্শনে আনন্দে দিশাহারা হইয়া পড়ে না।

মানুষ বাহ্যজগতে সুদৃশ্য যেমন দেখিতে পায়, যেমন অনুভব করিতে পারে ও যেমন তাহাতে মুগ্ধ হইয়া পড়ে, অন্তর্জগতের দৃশ্যে তদপেক্ষা অনেক অধিক ভাবে বিমোহিত হয়।

অন্তর্জগতে দৃশ্য—প্রথম।

বর্দ্ধমান-জলপ্লাবন।

বিগত বর্দ্ধমান জলপ্লাবনে যখন বর্দ্ধমানের বহু স্থান ভাসিয়া যায়, মৃতাবশিষ্ট অধিবাসিগণ বৃক্ষশাখা অবলম্বন করিয়া অনা-হারে অনিদ্রায় অবস্থান করে, কলিকাতার বহু যুবক আপনাদের সুখস্বচ্ছন্দ তুচ্ছ করিয়া তাহাদের বিপদ্ আত্মবিপদ্ জ্ঞান করিয়া বর্দ্ধমানের দিকে ছুটিতে লাগিল। বহু লক্ষপতির সন্তান নিজ নিজ মস্তকে আহারীয় দ্রব্যভার বহন করিয়া মৃতাবশিষ্ট অধি-বাসীদিগের ক্ষুৎপিপাসা শান্ত করিতে ছুটিল; সে দৃশ্য যিনিই

দেখিয়াছেন তিনিই বলিয়াছেন, এমন দৃশ্য সৌন্দর্য্যের আধার হিমালয়ের দৃশ্য পরাজয় করিয়াছে। যেসকল ধনিসন্তান কলিকাতায় গাড়ী পাল্কী ব্যতীত কখন পদব্রজে গমনাগমন করিতে শিখে নাই, তাহারা যখন আধ মণ ত্রিশ সের খাদ্য-পূরিত এক একটী বোঝা নিজ নিজ মস্তকে ধারণ করিয়া একটী যষ্টি-মাত্র পথ-প্রদর্শক করিয়া একবুক জল ঠেলিতে ঠেলিতে অভুক্ত বিপন্ন লোকদিগের নিকট পৌঁছিবার জন্য যাইতে লাগিল, সে দৃশ্য দেখিয়া, বোধ হয়, বিমানচারী দেবগণ নিমেষহীন লোচনে দেখিয়া আনন্দে নিস্পন্দভাব ধারণ করিয়াছিলেন। যিনি যত বড় কঠোরহৃদয় হউন না, এ দৃশ্যে তাঁহার চক্ষু যে নির্নিমেষ হইয়া গিয়াছিল, আনন্দের বারিধারা গণ্ডদ্বয়কে ভাসাইয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এই সময়ে একটী ছাত্র জ্বর রোগে আক্রান্ত হইয়া জলপ্লাবনে বিপন্নদিগের সাহায্য করিতে অসমর্থ হওয়াতে বড়ই আকুল-চিত্ত হইয়া পড়িল। ভগবানের কৃপায় তাহার জ্বর ছাড়িয়া গেল, সে দুই এক দিনের মধ্যেই পথ্য পাইল। যে দিন পথ্য পাইল পরদিন অপরাহ্নে সে বগলে দুইখানি বস্ত্র লইয়া রিক্তপাদে তাহার পিতার সম্মুখে দাঁড়াইল, এবং ক্ষীণ-কণ্ঠে বলিল, "বাবা, আমি বর্দ্ধমানে বিপন্নদিগের সাহায্য করিতে যাইব।" এই সুমধুর বাণী শ্রবণে পিতার চক্ষু জলে ভরিয়া গেল। তিনি মহাসমস্যায় পড়িলেন। যদি পুত্রকে যাইবার অনুমতি দেন, ক্ষীণদেহ পুত্র নিশ্চয়ই বিপন্নের সাহায্য করিতে গিয়া আপনাকেই বিপন্ন করিবে। কিন্তু যদি যাইতে না দেন

একটী শুভ ইচ্ছা অসম্পন্ন থাকিবে। পিতা নিরুত্তর, মনে মনে কেবল ভগবান্‌কে ডাকিতে লাগিলেন। পুত্র 'মৌন সম্মতি-লক্ষণ' ভাবিয়া পিতৃচরণে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিল। পিতার চিত্ত দুর্ভাবনায় আকুল হইল, তিনি কেবলই ভাবিতে লাগিলেন, কল্যই তারযোগে সংবাদ আসিবে "তোমার পুত্র অমুক ঠিকানায় জ্বরের পুনরাক্রমণে আক্রান্ত হইয়া পড়িয়া আছে।" এ অবস্থায় ভগবানের কৃপার উপর নির্ভর ভিন্ন আর অন্য উপায় রহিল না। দিবসের পর দিবস চলিয়া যাইতে লাগিল, দশ বার দিন অতিক্রান্ত হইল, পুত্র প্রত্যাবর্ত্তন করিল না। পিতার চিত্ত বড়ই আকুল হইয়া পড়িল। ইহার পর একদিন পিতা নিজ গৃহচত্বরে দাঁড়াইয়া আছেন, পুত্র হঠাৎ সম্মুখে উপস্থিত হইয়া পিতৃচরণে প্রণাম করিল। পিতা স্বর্গ হাতে পাইয়া তখনই পুত্রকে আলিঙ্গন করিলেন ও আনন্দে মস্তক চুম্বন করিতে লাগিলেন। পিতা দেখিলেন পুত্রের দেহ এই অল্প সময়ের মধ্যেই সম্পূর্ণ সবল হইয়াছে, দেহের সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠাতে আরও রূপবান্ হইয়াছে। মনে হইত লাগিল, যেন পুত্র দার্জ্জিলিঙে শরীর সারিবার জন্য তিন মাস অতিবাহিত করিয়া স্বাস্থ্যলাভান্তে ঘরে ফিরিয়াছে। রক্তাধিক্যে দেহ লাল হইয়া উঠিয়াছে। দেহ এমন সুস্থ, সবল, অধিকতর সুন্দর কেমন করিয়া হইল ? কোনও ধনীর আশ্রয়ে কি থাকিতে পারিয়াছিলে ? ইত্যাদি প্রশ্নান্তে যখন পিতা জানিতে পারিলেন, পুত্র বিপন্নদিগের ক্লেশ লাঘব করিবার অভিপ্রায়ে সমস্ত দিন কঠোর পরিশ্রম করিয়াছে, আহারীয় দ্রব্যভার মস্তকে বহন করিয়া একবুক জল ঠেলিতে ঠেলিতে তিনবার সর্পদংশন

অতিক্রম করিয়াছে এবং বিপন্নদিগের দ্বারে দ্বারে উপস্থিত হইয়া তাহাদের ক্লেশভার লাঘব করিয়াছে, এমন কি, অধিবাসীদিগের ভগ্নাবশিষ্ট গৃহের সম্মুখে পতিত মৃত গোমেষাদি সুদূরে নিক্ষেপ করিয়া তাহাদিগকে উদ্বেজক দুর্গন্ধ হইতে মুক্ত করিয়াছে, নিজের আহারের জন্য কোনও দিন ছোলাভাজা মিলিয়াছে, কোনও দিন দিবাশেষে স্বহস্তে পক্ক আলুভাতে ভাত ঘুটিয়াছে, তখন তাঁহার বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না। এই সকল দৃশ্য তিনি যতই মনে মনে চিত্রিত করিতে লাগিলেন, যতই মানসনেত্রে দেখিতে লাগিলেন ; তিনবার তিন স্থানে কালসর্প ফণা তুলিয়া দংশনার্থ পুত্রের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে, তিনবারই কি ভাবিয়া সরিয়া গিয়াছে, পুত্র ভীষণ বিপদ্ মধ্যে স্থিরভাবে আঁধারে দণ্ডায়মান আছে, এক ক্রোশের মধ্যে জন মানব নাই যে ডাকিয়া কাহারও সাহায্য প্রার্থনা করিবে,—ততই তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস হইতে লাগিল, এই বিচিত্র সেবার মধ্যে ভগবানের কৃপাহস্ত নিশ্চয়ই প্রসারিত ছিল। আকাশচারী দেবগণ এই দৃশ্যে মুগ্ধ হইয়া যে সেবকদিগের সঙ্গ ত্যাগ করেন নাই সে বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ রহিল না।

পিতা মানসনেত্রে যতই সেবকদিগের এই বিচিত্র চিত্র দেখিতে লাগিলেন, ততই তিনি মুগ্ধ হইতে লাগিলেন। তাঁহার বাক্যের স্ফূর্ত্তি রহিল না, তিনি নিমীলিত লোচনে ভগবচ্চরণে বার বার প্রণিপাত করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'ভগবন্, তোমার মহিমা বুঝা মানুষের সাধ্য নয়। কোথায় আমার পুত্র রোগাক্রান্ত হইয়া মুমূর্ষু অবস্থায় ফিরিবে, তাহা না হইয়া তাহাকে সুস্থ সবল ও অধিকতর রূপবান করিয়া আমার নিকট উপস্থাপিত

করিলে! ধন্য তোমার লীলা! কেহ সাধু কার্য্য অনুষ্ঠান করিবার প্রস্তাব মাত্রও করিলে, তুমি তাহার আশ্রয়স্বরূপ হইয়া তাহাকে সর্ব্ববিপদ্ হইতে অপূর্ব্বভাবে রক্ষা কর, তাহাকে সমুদ্রের মনোরম দৃশ্য অপেক্ষা সুদৃশ্য করিয়া তুল'।

দৃশ্য—দ্বিতীয়।

মাতৃমূর্ত্তি।

এক দিন ডায়মণ্ড হারবারের ট্রেণখানি মগরাহাট ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়াছে, এমন সময়ে একটী স্ত্রীলোক শশব্যস্তে উপস্থিত হইয়া ষ্টেশনমাষ্টারকে জানাইলেন, 'মহাশয়, ট্রেণখানি এখানে পৌঁছিবার কিছু পূর্ব্বে আমাদের গাড়ি হইতে একটী ছোট ছেলে পড়িয়া গিয়াছে। ছেলেটীকে পড়িয়া যাইতে দেখিয়া বালিকা মাতা, 'ওগো আমার খোকা পড়িয়া গেল, আমার খোকা বুঝি মারা পড়িল' এই বলিতে বলিতে নিজেও গাড়ি হইতে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াছে। বোধ হয় মা ও ছেলে দুইটীই মারা পড়িয়াছে। তাহাদের কি দশা হইয়াছে দয়া করিয়া তাহার সংবাদ লউন'।

ষ্টেশনমাষ্টার ব্যাকুলচিত্তে ট্রেণের ড্রাইভারকে বলিলেন, 'আপনি এখনই ট্রেণ হইতে এঞ্জিনখানি বিযুক্ত করিয়া, তাহাতে অন্য রেল দিয়া উহাদের পতন স্থানে গমন করুন। মায়ের ও ছেলের কি দশা হইয়াছে, শীঘ্র, এঞ্জিন সাহায্যে উপস্থিত হইয়া,

প্রত্যক্ষ করুন এবং উহাদিগকে যে অবস্থায় পাইবেন সেই অবস্থায়ই এই স্থানে আনয়ন করুন।'

ড্রাইভার এঞ্জিন বিযুক্ত করিয়া তাহা তীরবেগে চালাইয়া পথের দুইধার দেখিতে দেখিতে চলিলেন। ট্রেণের সমস্ত লোক উদ্‌গ্রীব হইয়া, কি সংবাদ আসে, আকুল হইয়া, তাহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

ড্রাইভার প্রায় এক মাইল দূরে যাইয়া স্নেহময়ী বালিকা জননী ও শিশুসন্তান উভয়কেই দেখিতে পাইলেন। ষোড়শী জননী সন্তানটী বুকে করিয়া বসিয়া স্তন্য দান করিতেছেন; ইতি পূর্ব্বে যে দুই গণ্ড দিয়া শোকবারি প্রবাহিত হইতেছিল, সেই দুই গণ্ডে আনন্দবারি ঝরিতেছে। মুখপদ্ম বিকসিত, তাহাতে এক অপূর্ব্ব শ্রী প্রকাশ পাইতেছে।

ড্রাইভার কাছে ছুটিয়া গিয়া, 'মা, তোমার শিশু সন্তান আহত হয় নাই? তুমিও মা আহত হও নাই?' বালিকা জননীর মুখে কথা নাই; তিনি অপার আনন্দে নিমগ্না, 'কেবল মস্তক চালনা করিয়া জানাইলেন তাঁহারা কেহই বিশেষ আহত হন নাই। ড্রাইভার এক্ষণে আনন্দবিস্ফারিত নেত্রে এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে হইতে লাগিল, ইনি স্বয়ং ভগবতী অচল-নন্দিনী। মানুষের ভিতর এমন শোভা সম্ভবপর নহে। ড্রাইভার যতই দেখিতে লাগিলেন, ততই ধারণা হইতে লাগিল, আজ সাক্ষাৎ পরমেশ্বরীর দর্শন পাইলাম। বিশেষ পুণ্য না থাকিলে এমন দেবীরূপ দর্শন কখন মানুষের ভাগ্যে ঘটিতে পারে না।

ড্রাইভার শেষে হস্ত দুইখানি যোড় করিয়া, 'মা, তোমার জন্য গাড়ি আনিয়াছি, ইহাতে আরোহণ করিয়া ষ্টেশনে চল; তোমাকে দেখিবার জন্য কত লোক উদ্‌গ্রীব হইয়া অপেক্ষা করিতেছে! তুমি তাহাদিগকে দর্শন দিয়া কৃতার্থ কর। তোমার দেবীমূর্ত্তি দেখিয়া তাহারা আজ আপনাদিগকে ধন্য মনে করিবে'। এই বলিয়া, ড্রাইভার শিশু সন্তান সহ বালিকা জননীকে এঞ্জিনে তুলিলেন এবং ষ্টেশনে উপস্থাপিত করিয়া সকলের কৌতূহল-বিস্ফারিত নয়নেন্দ্রিয়কে পরিতর্পণ করিলেন। যাঁহারাই দেখিতে লাগিলেন সকলেরই নেত্র নিমেষহীন হইল। এমন সুদৃশ্য তাঁহারা জীবনে কখন দেখেন নাই। বলিয়া একবাক্যে সকলেই "মা বড় ধন" এই মহাবাক্যের বার বার আবৃত্তি করিতে লাগিলেন।

দৃশ্য—তৃতীয়।

বীরত্ব।

একদিন একটী ভদ্রলোক শুভ্রবস্ত্রে সজ্জিত হইয়া এবং আপনার একটী স্বল্পবয়স্কা কন্যাকে বেশভূষায় সুসজ্জিত করিয়া কলিকাতা কলেজষ্ট্রীট্ দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি অন্যমনস্ক থাকায় তাঁহার কন্যা ট্রাম গাড়ির পথের উপর গিয়া পড়ে। এমন সময়ে একখানি ট্রামশকট বেগে বালিকার অভিমুখে আসিয়া পড়িল। "বালিকা ট্রামে পিষিয়া গেল, পিষিয়া মারা পড়িল, ট্রামচালক! বাঁধো বাঁধো" বলিয়া পার্শ্ববর্ত্তী সমুদায়

লোক চীৎকার করিতে লাগিল। ট্রামচালকও বিপদ্ গণনা করিয়া ট্রাম বাঁধিবার প্রযত্ন করিতে লাগিল; কিন্তু বালিকা এত নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে যে ট্রাম বাঁধিতে বাঁধিতেই গাড়ির চাকায় নিষ্পিষ্ট হইবার উপক্রম হইল। যাঁহার কন্যা তিনি কাতর বাক্যে, "ওগো আমার কন্যা ট্রামে পিষিয়া মরিতেছে, কে রক্ষা করিবে? ভগবান্ রক্ষা কর, ভগবান্ রক্ষা কর, ভগবান্ রক্ষা কর" বলিতে বলিতে অধীর হইয়া পড়িলেন। কন্যা সম্মুখে পিষিয়া মরিতেছে এ দৃশ্য তিনি কিরূপে দেখিবেন? সুতরাং তিনি এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখিতে অসমর্থ হইয়া চক্ষু নিমীলিত করিয়া শোকে কাঁপিতে লাগিলেন। কেবল আর্ত্তনাদ ও 'ভগবান্ রক্ষা কর' এই বাক্য ভিন্ন অন্য কথা আর মুখে নাই। পথের সমুদায় লোক, "আহা মেয়েটী বুঝি মারা পড়িল, কি সর্ব্বনাশ! যাহার কন্যা সে কি পথে ঘুমাইয়া চলিতেছিল? আহা এমন মেয়েটী বুঝি পিষিয়া গেল" ইত্যাদি কাতর ভাবে বলিতে লাগিল।

এইরূপ চারিদিকে মহা কাতরধ্বনি হইতেছে, এমন সময়ে দেখা গেল একটী সুপুরুষ যুবক ট্রাম হইতে সম্মুখে লম্ফ দিয়া পড়িল। ট্রামের বেগ ও তাহার লম্ফনবেগ উভয়বেগ একত্র হওয়াতে ট্রামের বেগ অপেক্ষা তাহার গতি অধিক হইল, সুতরাং সে ট্রামের সম্মুখে দুই হস্ত দূরে পতিত হইল, এবং পতিত হইয়াই বালিকাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইল। পথের সমস্ত লোক চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "আহা বালিকাটীকে রক্ষা করিতে গিয়া একটী ভদ্র যুবকও সঙ্গে সঙ্গে পিষিয়া মরিতে

বসিল। ইঁহার মা-বাপের কি দুর্ভাগ্য! তাঁহারা এমন ছেলে হারাইয়া কিরূপে বাঁচিবেন?"

এইরূপ চারিদিকে আর্ত্তনাদ হইতেছে, যুবক এক লম্ফে ট্রামের নেমী পথ উল্লঙ্ঘন করিয়া কম্পমান শোকবিহ্বল পিতার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, এবং "এই নিন আপনার কন্যা" বলিয়া তাঁহার ক্রোড়ে বালিকাকে সমর্পণ করিয়া আবার ট্রাম গাড়ির উপর গিয়া বসিলেন।

আনন্দে বিহ্বল পিতা মৃতোত্থিতবৎ কন্যাকে নিজ ক্রোড়ে পাইয়া ভদ্র যুবককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মহাশয়, আপনি কে? কোন্ মহাবংশ আপনার আবির্ভাবে পবিত্রতর করিয়াছেন? অনুগ্রহ করিয়া আপনার পরিচয় দিন। আপনি ট্রাম হইতে নামুন, আমি আপনার পূজা করিব। আপনি কোন্ কুলতিলকের পুত্র হইয়া তাঁহাকে কৃতার্থ করিয়াছেন, কোন রত্নগর্ভা জননীর নয়নাভিরাম হইয়া তাঁহাকে রমণী জাতির উচ্চ আসনে বসাইয়াছেন? আপনার পরিচয় দিন, চলিয়া যাইবেন না।"

পিতা যখন এইরূপ ব্যগ্রভাবে যুবকের নিকট আত্মচরিতার্থতা জ্ঞাপন ও অনুনয় বিনয় করিতেছিলেন, তখন সেই যুবকের মুখে মৃদু মৃদু হাস্য থাকিলেও বিনয়ে মস্তক অবনত হইতেছিল। মুখে কথা নাই, কেবল বিনয়মাখা মূর্ত্তিখানি দেবমূর্ত্তিবৎ প্রতিভাত হইতে লাগিল। যুবক একে সুপুরুষ, তাহাতে আবার বিনয়াবনম্র হওয়াতে কি যে সুন্দর দেখাইতে লাগিলেন, তাহা পথচারী ব্যক্তিগণ বর্ণনা করিয়া উঠিতে পারিল না। তাহারা নির্নিমেষ লোচনে তাঁহার নিষ্কলঙ্ক মুখচন্দ্র যতই দেখিতে

লাগিল ততই তাহাদের দর্শন-স্পৃহা বাড়িতে লাগিল, ততই মনে হইতে লাগিল আমরা আজ সাক্ষাৎ দেবতা দেখিতেছি।

যুবক যখন কোনও উত্তর দিলেন না, ট্রাম চালিত হওয়াতে ক্রমে দৃষ্টির বহির্ভূত হইতে লাগিলেন, তখন পথের একটী লোক বলিলেন, আমি ঐ যুবককে জানি; ইনি বিদ্যাসাগরের মেট্রপলিটান্ কলেজে পড়েন। আজ মেট্রপলিটান্ ধন্য হইল। আজ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কলেজ করিবার মহাপ্রযত্ন সার্থক হইল। আজ কলেজের অধ্যক্ষ সারদারঞ্জন রায়, ছাত্রদিগকে বলিষ্ঠ ও সাহসিক করিবার জন্য, যে এথ্‌লেটিক ক্লবের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা চরিতার্থ হইল।

দৃশ্য—চতুর্থ।

পরের বিপদে আত্মবিপদ্।

রাণীগঞ্জ গিরিডি প্রভৃতি প্রদেশে পাথুরিয়া কয়লার খনি আছে। কয়লার খনিকে সচরাচর লোকে 'খাদ' বলিয়া থাকে। একদিন গিরিডিতে কোন খাদের মধ্যে বহু কুলি কাজ করিতেছে, এমন সময়ে কোল আপিসের বড় বাবু তাহার পরিদর্শনার্থ তথায় অবতরণ করিলেন। তিনি ইতস্ততঃ পরিদর্শন করিতেছেন, এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন একটা ফাট্‌লা দিয়া জল উঠিতেছে। জলের গতির প্রাবল্য দেখিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন, গতিক ভাল নহে; এই জল বন্যার আকার ধারণ করিতে পারে। সুতরাং তিনি সমস্ত কুলিকে ডাকিয়া বলিতে লাগিলেন, তোমরা

কাজ ছাড়িয়া দিয়া লিফ্‌টের দিকে আইস, ও ইহা দ্বারা খাদের উপরে উঠিয়া গিয়া আত্মরক্ষা কর; ভয়ানক বিপৎপাতের সম্ভাবনা হইয়াছে। কুলিগণ এই সংবাদে ভীত হইয়া, যুবক যুবতী, বালক বালিকা সকলেই, লিফ্‌ট্ দ্বারা উপরে উঠিতে লাগিল। কিন্তু সকলে উঠিতে পারিল না। অল্পক্ষণ মধ্যেই স্রোত বন্যার আকার ধারণ করিল। কয়েকটী কুলি বালক বালিকা ও বড়বাবু পড়িয়া রহিলেন। বড় বাবুর গায়ে যথেষ্ট শক্তি থাকাতে তিনি অক্লান্তভাবে সাঁতার দিতে লাগিলেন, মনে ভীতির সঞ্চার না হওয়াতে তিনি বিপদে অভিভূত হইলেন না। সমস্ত প্রদীপ নিবিয়া যাওয়াতে এমন সূচীভেদ্য অন্ধকার আবির্ভূত হইল, যে কেহই কিছুই দেখিতে পাইল না। কুলি বালক বালিকাগণ আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল, এবং বড় বাবুকে কাতর স্বরে, সাহায্যার্থ আহ্বান করিতে লাগিল। বড়বাবু অনবরত সাড়া দিতে লাগিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, 'তোমরা আমার পৃষ্ঠে আশ্রয় গ্রহণ কর; আমার গায়ে যে জোর আছে তাহাতে আমি তোমাদের মত তিন চারি জনকে পৃষ্ঠে করিয়া সাঁতার দিতে পারিব। খাদের কুলিরা বড় বাবুকেই মনিব বলিয়া জানে। মনিবের ঘাড়ে কেমন করিয়া উঠিবে? বিশেষতঃ ইনি একজন মহাকুলীন ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণের গায়ে যে পা লাগিবে।—ইত্যাদি ভাবনায় তাহারা ইতস্ততঃ করিলেও তিনি তাহাদিগকে হাচা হাচা করিয়া ধরিয়া আপন পৃষ্ঠে বসাইলেন, এবং প্রগাঢ় অন্ধকার মধ্যে সন্তরণ দিতে লাগিলেন, কিন্তু যে লিফ্‌ট্ দ্বারা খাদ হইতে উঠিবেন তাহার সন্ধান পাইলেন না। কি ভয়ঙ্কর বিপদ্! এই বিপদ্

চিন্তা করিতেও হস্ত পদ অসাড় হইয়া পড়ে! বড়বাবু ভাবিলেন 'যেরূপ দেখিতেছি তাহাতে যে উদ্ধার পাইব তাহার ত আশা হয় না, তথাপি ছেলে মেয়েগুলিকে বাঁচাইতেই হইবে। ভগবন্! আমি স্রোতে গা ভাসাইয়া দিলাম, তুমি যেখানে ইচ্ছা লইয়া যাও। এই বলিয়া দুর্গতিহারিণী-দুর্গানাম করিতে লাগিলেন; তাঁহার মনে বল আসিল, তিনি স্রোতে ভাসিয়া যাইতে লাগিলেন। পৃষ্ঠে কুলি বালক বালিকা, মুখে দুর্গানাম, প্রগাঢ় অন্ধকারে সন্তরণ। এদৃশ্য মানুষে দেখিতে পাইল না। কেবল পরোক্ষদর্শি-দেবগণই নির্নিমেষলোচনে দেখিতে লাগিলেন, এবং তাঁহার হৃদয়ে সাহস সঞ্চার করিয়া দিতে লাগিলেন।

বড় বাবুর হস্ত পদ অসাড় হইবার পূর্ব্বেই তিনি স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে খাদ হইতে বাহিরে আসিয়া পড়িলেন। আলোক দেখিতে পাইয়া তিনি উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া বলিলেন, "বৎসগণ, ভগবান্ তোমাদিগকে রক্ষা করিলেন, আর ভয় নাই, আলোকে আসিয়া পড়িয়াছি। ভাগ্যে আমি তোমাদিগকে রক্ষা করিতে গিয়াছিলাম, তাই ভগবান্ আমাকেও রক্ষা করিলেন।" যখন তিনি কুলি বালক বালিকা পৃষ্ঠে লইয়া লোকদৃষ্টিতে পতিত হইলেন, তখন তাঁহার সে দৃশ্য বহু লোকে দেখিতে পাইয়াছিল। সকলেই তাঁহার এই অসাধ্য কার্য্যে স্তম্ভিত হইয়া বলিয়াছিল, লোকে ব্রাহ্মণকে যে ভূদেব বলে, ইনি তাহা প্রমাণিত করিলেন। ইঁহাকে আমরা আর মানুষ বলিব না। এই বলিয়া সকলে তাঁহার পাদস্পর্শ করিতে লাগিল; তাঁহাকে যতই দেখিল ততই তাহাদের দর্শন স্পৃহা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

দৃশ্য—পঞ্চম।

কুলকামিনীকে রক্ষা।

এক দিন একটী যুবক ছাত্র গন্তব্য স্থান হইতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে, এমন সময়ে দেখিতে পাইল একটী চতুর্দ্দশবর্ষীয়া কুলকামিনী চকিত ও কাতর দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিতে চাহিতে আসিতেছে। তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বহু লোক তাহাকে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছে। কিন্তু বালিকা রমণী তাহাদের কোনও কথার উত্তর দিতেছে না, কেবল স্খলিত পদে ব্যাকুল ভাবে চলিতেছে। বালিকা এই ছাত্র যুবককে দেখিতে পাইয়াই, যেন কতই পরিচিত এই ভাবে সম্বোধন করিয়া বলিল, "মহাশয়, আপনি কোথায় যাইতেছেন? আমি মারের ভয়ে আমার শ্বশুরালয় হইতে পলাইয়া আসিয়া মহাবিপদে পড়িয়াছি। আপনি আমার একটা উপায় করুন।"

তখন রাত্রি ৮টা। যুবক বলিল, 'ভগিনি, তোমার শ্বশুরালয় বা পিত্রালয়ের ঠিকানা বল, আমি তোমাকে তথায় পৌঁছাইয়া দিতেছি। বালিকা উত্তর করিল, ছয় মাস মাত্র হইল আমার বিবাহ হইয়াছে। আমি এই দ্বিতীয় বারে শ্বশুরালয়ে আসিয়াছি। আমি আমার মৃত শ্বশুরের নাম, স্বামীর নাম, দেবরের নাম বলিতে পারি, কিন্তু স্থানের নাম জানি না।

যুবক বলিল, তবে তোমার পিত্রালয়ের ঠিকানা বল।

বালিকা বধূ বলিল, "আমার পিতার নাম এই, তিনি এই কাজ করেন; বাড়ীর নম্বর জানি, কিন্তু এক্ষণে আমি এমন বিমূঢ়

হইয়াছি যে আমার পিত্রালয় কোন্ গলির ভিতর তাহার নাম কিছুতেই মনে আসিতেছে না। আপনি আমাকে এই রাত্রির জন্য আশ্রয় দিন, আপনার কে আছেন ?" যুবক উত্তর করিল, আমার মা আছেন, বাপ আছেন, ভাইয়েরা আছেন, ভ্রাতৃবধূরা আছেন। ললনা অমনি ঔৎসুক্যসূচক বাক্যে বলিল, তবে আপনি দয়া করিয়া আপনার বাটীতে লইয়া যান। আমি সেই স্থানে যাইলেই নিরাপদ্ হইব।

যুবক বিরক্তভাবে বলিল, তুমি যখন নিজের শ্বশুরালয় বা পিত্রালয়ের ঠিকানা দিতে পারিতেছ না, তখন আমি তোমাকে লইয়া যাইতে পারিব না। তুমি অন্য উপায় দেখ। তোমার অনুসরণকারী বহু ব্যক্তি, মাতৃ সম্বোধনে, বাছা সম্বোধনে আহ্বান করিয়া সাহায্য দান করিতে চাহিতেছেন, তুমি উহাদের মধ্যে কাহাকে বল। যে রমণী নিজের পিত্রালয়েরও ঠিকানা দিতে পারে না, আমি তাহার সাহায্য করিতে পারিব না।

যুবকছাত্রের এই বাক্যে নবীনা বধূ অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িল। যুবকের সরলতামাখা মূর্ত্তিতে বালিকা এমন কিছু দেখিতে পাইয়াছিল যাহাতে তাহার ধারণা হইল, ইঁহারই সাহায্যে আমি আজ এ বিপদ্ হইতে উদ্ধার পাইব। ইনি যদি আমাকে ছাড়িয়া যান, কাহার মনে কি আছে, কি করিয়া বলিব ? যদিও ইঁহারা আমাকে মাতৃসম্বোধন করিতেছেন, তথাপি ইঁহাদের উপর আমার মন যখন সন্দিগ্ধ হইতেছে, তখন ইঁহাদের আশ্রয় লওয়া উচিত নহে। এইরূপ ভাবিয়া বালিকা শেষে কাতর ভাবে উক্ত যুবকেরই পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। যুবক যখন

দেখিল, বালিকা তাহার শরণাগত হইয়াছে, তখন তাঁহার পদ স্খলিত হইল, সে আর তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারিল না। তখনি ভগিনীসম্বোধনে বলিল, আইস বোন, আমার সঙ্গে, আমাদের গৃহে তোমাকে রাখিয়া তোমার বাপের বাড়ীর সন্ধান লইব।”

যখন অনুসরণকারী ব্যক্তিরা দেখিল, বালিকা যুবকের অনুসরণ করিল, তখন তাহারা যুবককে ভয় দেখাইয়া বলিতে লাগিল, মহাশয়, আপনি বিপদে ঝাঁপ দিবেন না। বালিকার পিতা শ্বশুর ও স্বামী, আপনি কুলকামিনীকে গৃহের বাহির করিয়াছেন এই অপবাদ দিয়া আপনাকে মহাবিপদে ফেলিবে। আপনি এখন হইতেই সতর্ক হউন, আমরা আপনার ভয়ানক বিপৎপাত দেখিতেছি।

ভদ্র যুবক তাহাদিগকে সবিনয়ে বলিল, যখন আশ্রয় দিতে বাধ্য হইয়াছি, তখন যদি ভগবান্ বিপদ্ দেন তাহা ঘাড় পাতিয়া লইতেই হইবে। পরের উপকার করিতে গিয়া কি লোকে বিপন্ন হয় না? জলমগ্ন ব্যক্তিকে উদ্ধার করিতে গিয়া কি লোকে নিজেও জলমগ্ন হইয়া প্রাণ হারায় না? নিজের বিপদ্ ঘটিতে পারে এরূপ ভাবিয়া কটা লোকে বিপন্নের উপকার করিতে পারে? আপনারা আমাকে বৃথা ভয় দেখাইতেছেন! দয়ার এমন ধর্ম্মই নহে যে, দয়া করিবার সময় লোকে নিজের বিপদ্ গণনা করিবে? সে কেবল বিপন্নের উদ্ধারার্থ উপায় খুজিতে থাকে, আপনার বিষয় ভাবিবার অবসর পায় না।

যখন পার্শ্ববর্ত্তী ব্যক্তিবর্গ যুবককে স্বকর্ত্তব্য হইতে নিবৃত্ত

করিতে পারিল না, তখন তাহারা যুবকের প্রতি নানা বিদ্রূপ বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিল। যুবক তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া বালিকাকে সঙ্গে লইয়া নিজ আলয়ে উপস্থিত হইল ও মাতৃহস্তে তাহার ভার সমর্পণ করিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে যুবকের পিতা স্বগৃহে উপস্থিত হইয়া আদ্যন্ত সমস্ত শ্রবণ করিলেন ও "ঠিক কাজ করিয়াছ," বলিয়া অশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিলেন।

বালিকা বধূ তাহার পিত্রালয়ের বা শ্বশুরালয়ের ঠিকানা বলিতে না পারিলেও তিনি তাহার আত্মীয়দের নাম, ও তাঁহারা কি কাজ করেন ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। শেষে জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার পাড়াতেই তাহার এক আত্মীয় ব্যক্তি বাস করেন। তিনি ব্যগ্র হইয়া উক্ত আত্মীয়ের নিকট গিয়া বালিকার সমস্ত সংবাদ পাইলেন ও পিত্রালয়ে সংবাদ দিলেন। শ্বশুরালয় হইতে তাহার স্বামী সংবাদ পাইয়া পত্নীর অধ্যুষিত স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখেন, ইহা তাঁহার শিক্ষকের বাটী। বাটীর কর্ত্তা তাঁহাকে কলেজে পড়াইয়াছেন। বালিকা পত্নী কোনও অপরিচিতের বাটীতে বাস করে নাই, তাহার গুরু-গৃহে রাত্রি যাপন করিয়াছে, জানিয়া স্বামী আনন্দে বিগলিত হই-লেন, এবং পরগৃহবাস দোষাবহ হইল না, বলিয়া অশেষ তৃপ্তিলাভ করিতে লাগিলেন। ভগবন্! তোমার কৃপাতেই আজ আমাদের জাতিকুল রক্ষা হইল! তুমি আমার গুরুদেবের সাধু পুত্রের হাতে আমার স্ত্রীর ভার দিয়া আমাদের বংশকে নিষ্কলঙ্ক অবস্থায় রাখিলে! এই সকল কথা যখন তিনি মনে মনে বলিতেছিলেন

এবং কৃতজ্ঞতায় তাঁহার হৃদয় আপ্লুত হইতেছিল, তখন তিনি নিস্পন্দভাব ধারণ করিতেছিলেন, তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় কৃতজ্ঞতা-বারিতে ভরিয়া যাইতেছিল, এবং রবি ঠাকুরের যে শ্লোক আছে—

দয়া বলে "কেগো তুমি মুখে নাই কথা।"
অশ্রুভরা আঁখি বলে "আমি কৃতজ্ঞতা॥"

ইহার ভাব উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে হৃদয়ঙ্গম করাইতেছিল। এই দৃশ্য যে কি সুদৃশ্যরূপে প্রতিভাত হইয়াছিল তাহা বর্ণনাতীত।

দৃশ্য—ষষ্ঠ।

পরবিপদে প্রাণদান।

কলিকাতায় মিউনিসিপ্যালিটির যে সকল জল নির্গমনের পথ আছে, তাহাতে সঞ্চিত পঙ্কাদি উদ্ধার করিবার জন্য তাহার ভিতরে নামিবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বার আছে। সেই দ্বার দিয়া ছোট ছেলে ভিতরে যাইতে পারে, বৃহৎ দেহ তাহাতে প্রবেশ করিতে পারে না। সেই জন্য নালা পরিষ্কার করিবার জন্য ছোট ছোট কুলি-ছেলেদিগকে নিযুক্ত করা হয়।

ভবানীপুরে একটী কুলির ছোট ছেলে ড্রেণ পরিষ্কার করিবার জন্য ক্ষুদ্র দ্বার দিয়া ভিতরে নামিতে লাগিল, তৎকর্ত্তৃক উত্তোলিত পঙ্কাদি ফেলিবার জন্য বলিষ্ঠ অধিক বয়স্ক এক কুলি বাহিরে দণ্ডায়মান রহিল। বালক ড্রেণের ভিতর নামিয়াই ভীষণ চীৎকার করিয়া উঠিল। উপরিস্থ কুলি, কি হইয়াছে, কি হইয়াছে, বলিয়া যতই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল তাহার কোনও উত্তর না পাইয়া

ERIAL

ব্যাকুল হইতে লাগিল। অল্প দূরেই বাবু নফর চন্দ্র কুণ্ডু উপস্থিত ছিলেন, তিনি কুলিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি হইয়াছে?' কুলি কাতরভাবে বলিল 'ছেলেটী ড্রেণে নামিয়াই মহাচীৎকার করিল, তাহার পরে আর সাড়া দিতেছে না। নফরবাবুর, যেমন ইহা শ্রবণ, অমনি বালকের উদ্ধারার্থে এক লম্ফে গর্ত্ত মধ্যে পতন। হাঁ হাঁ করেন কি, করেন কি, উহাতে একেত বৃহৎ দেহ প্রবেশ করাইতে মহাকষ্ট, তাহাতে আবার বালক যে বিপদে পড়িয়া প্রাণ হারাইয়াছে আপনাকেও যে সেই বিপদে পড়িতে হইবে! কিন্তু এ সব কথা কে শুনিবে? তখন কি নফর বাবুর ভাবিবার অবসর আছে যে, আমার মা আছেন, আমার স্ত্রী আছেন, আমার ছেলেরা আছে। আমার অভাবে তাহারা আজ পথের ভিখারী হইবে, তাহাদের আর্ত্তনাদে গগন ফাটিয়া যাইবে, বন্ধু বান্ধবদের দীর্ঘনিঃশ্বাসে ধরা কম্পমান হইবে! দয়ার এমন ধর্ম্মই নহে যে, তখন এই সকল আত্মীয়দিগের শোক-চিত্র তাঁহার হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া দিবে। নফরবাবু কাহারও মানা মানিলেন না, কাহারও বাধা গ্রাহ্য করিলেন না। দয়ায় তাঁহার হৃদয় স্বর্গীয় হইয়া গিয়াছে, তিনি কি পার্থিব স্বার্থে টলিতে পারেন? বালকটীকে উপরে তুলিয়া চিকিৎসা করিলে হয়ত বাঁচিতে পারে এই ধারণায় তিনি আপনাকে বিপদে ফেলিতে কিঞ্চিন্মাত্রও কুণ্ঠিত হইলেন না। তিনি অতি ক্লেশে আপনার বৃহৎ দেহ দ্বারমধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়াই যেমন ভিতরে উপস্থিত হইলেন অমনি তাঁহার স্বর্গীয় প্রাণপাখী মর্ত্ত্য-পিঞ্জর ছাড়িয়া স্বর্গে উড়িয়া গেল। তিনি অচেতন হইয়া পড়িলেন।

পথে অগণ্য লোক, আহা আহা, কি সর্ব্বনাশ! আমাদের দয়ার সাগর নফরবাবু এক কুলিসন্তানের জন্য আপনার মা স্ত্রী পুত্র পরিবার সকলকে বিপৎসাগরে ভাসাইলেন! তাহাদিগকে কে অন্ন দিবে? আজ একটি নীচজাতির ক্ষুদ্র বালককে রক্ষা করিতে গিয়া এতগুলি ভদ্রসন্তানের অনাহারে জীবন সংশয়াপন্ন করিয়া নফরবাবু স্বর্গে গেলেন! কে কোথায় আছ, নফরবাবুকে দড়ি দড়ার সাহায্যে গর্ত্ত হইত তুল, আমরা তাঁহার দেবতুল্য মূর্ত্তিখানি স্বচক্ষে দর্শন করিয়া দুর্ল্লভ পুণ্য সঞ্চয় করিব! তাঁহার চিত্র হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া রাখিব, নানাবিপৎসঙ্কুল সংসারে তাঁহার এই মূর্ত্তি ধ্যান করিয়া অশেষ সান্ত্বনা পাইব।

অল্পক্ষণ মধ্যেই তাঁহার পুণ্যময় দেহ ভূগর্ভ হইতে অপসারিত করা হইল। যেই শুনিতে লাগিল, সেই তাহার বিচিত্র মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিবার জন্য ছুটিয়া আসিতে লাগিলএবং শোকসন্তপ্ত-হৃদয়ে সাশ্রুনয়নে তাঁহার দিকে একদৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল। কাহারও আর নড়িবার সামর্থ্য রহিল না। নফরবাবুর মুখের চেহারা কি সুন্দর হইয়াছে, দেখ! ইহাতে কোনও পীড়াদি-জনিত যন্ত্রণার চিহ্নমাত্রও নাই। আহা কি সৌম্যমূর্ত্তি! এ মূর্ত্তি ইঁহার মা, ইঁহার স্ত্রী, ইঁহার সন্তানগণ, ইঁহার আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবগণ না দেখিতে পাইয়া কি রূপে প্রাণ ধারণ করিবে? আমাদেরই প্রাণ যখন ফাটিয়া যাইতেছে তখন তাঁহারা নিশ্চয়ই শোকে প্রাণত্যাগ করিবে। ধন্য ইঁহার পিতা মাতা! ধন্য ইঁহার আত্মীয় স্বজন! নফরবাবুর পরিচয় দিয়া ইঁহারা বংশপরম্পরায় আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিবে।

নফরবাবুর এই অলোকসামান্য দয়ার বার্ত্তা চারিদিকে প্রচারিত হইয়া পড়িল। রাজ্যের রাজার সিংহাসন টলিল। রাজা সংবাদ পাইয়া, হায়! আমার এমন প্রজা আমার রাজ্য ছাড়িল! লোকশিক্ষার্থ ইঁহার অমর হইয়া থাকা উচিত। ইঁহাকে এখনও অমর করিতে হইবে, এই বলিয়া স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন করিয়া তাঁহাকে চিরজীবী করিয়া রাখিলেন।

দৃশ্য—সপ্তম।

আকাকাহিনী।

ইংরাজ-রাজত্বে জঙ্গলের বৃক্ষাদি পর্য্যবেক্ষণার্থ অনেক অরণ্যে জঙ্গলাধ্যক্ষ ইংরাজের আপিস্ থাকে। কোনও এক জঙ্গলের নিকট পার্ব্বত্য প্রদেশে 'আকা' নামে অসভ্যজাতীয়গণ বাস করিত। আকাদিগের সহিত কোনও কারণে ঐ জঙ্গলের ইংরাজ অধ্যক্ষের মনোমালিন্য উপস্থিত হয়। তাহাতে আকারাজ উক্ত সাহেবকে রজ্জুতে আবদ্ধ করিয়া তাঁহার নিকট আনিতে পার্শ্বচরদিগকে হুকুম দেয়। পার্শ্বচরগণ রাজাজ্ঞা প্রতিপালনার্থ সুবিধা খুজিতে লাগিল।

একদিন ইংরাজাধ্যক্ষের কর্ম্মচারী কেদার নাথ চক্রবর্ত্তী কোনও কার্য্যোপলক্ষে আপিস হইতে সুদূরে গমন করে। আকারা কেদার নাথকে চিনিত, সুতরাং এই সুযোগেই তাহাকে একাকী পাইয়া আক্রমণ করিল ও লতাপাশে তাহার হস্ত পদ সংযত করিয়া কয়েক জনে তাহাকে ঝুলাইয়া লইয়া রাজোদ্দেশে

প্রস্থান করিল। কেদার নাথ বন্ধন যাতনায় যত চীৎকার করে, আকারা তদপেক্ষা অধিক চীৎকার করিয়া, তাহার স্বর ডুবাইয়া দিতে লাগিল। স্থানে স্থানে ঝোপের মধ্য দিয়া হিঁচড়াইয়া লইয়া যাওয়াতে কেদার নাথের অঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হইয়া শোণিত ক্ষরণ করিতে লাগিল। কেদার নাথ যতই তাহাদিগকে মিনতি করে তাহারা ততই চীৎকার করিয়া তাহার স্বর ঢাকিয়া ফেলে। কেদার নাথের যাতনার আর অবধি রহিল না।

এইরূপে যাতনা ভোগ করিতে করিতে কেদার নাথ বহু-দূরে আকারাজের সমীপে আনীত হইল। আকারাজের সমীপস্থ কর্ম্মচারিগণ কেদার নাথকে দেখিবামাত্র নিজ নিজ কোষ হইতে খড়্গ বাহির করিয়া, অসি হস্তে তাহার চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া নৃত্য করিতে লাগিল ও ইংরাজের এই কর্ম্মচারীকে আজ আমরা স্বহস্তে বলিদান দিতে পারিব, এই ভাব প্রকাশ করিয়া রাজার হুকুম অপেক্ষা করিতে লাগিল। তাহারা নাচিতে নাচিতে এক একবার কেদার নাথের কাছে আসিয়া তরবারিখানি তাহার স্কন্ধে স্পর্শ করিয়া রাজার নিকট তারস্বরে বধ প্রার্থনা করে এবং হুকুম দিতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া, মহা বিরক্তির সহিত আবার নাচিতে থাকে।

কেদার নাথ একেবারে জীবনে হতাশ হইয়া জগজ্জননীর শ্রীপদে অনাথ স্ত্রী পুত্রাদির ভার সমর্পণ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মনে মনে বলিতে লাগিল, "মা শঙ্করি, কোথায় আছ ? আমি যে ঘোর বিপদে পড়িয়াছি, এ বিপদ্ হইতে রক্ষা করিতে তোমা ভিন্ন আর কে আছে মা। আমাকে পিতৃমাতৃহীন দেখিয়া

বাল্যকাল হইতেই তুমি স্বয়ং আমার ভার লইয়া আমাকে এত বড় করিয়াছ। আমাকে স্ত্রী পুত্রের মুখ দেখাইয়াছ। এক্ষণে তোমার সেই বহু যত্নের সন্তান শত্রুর হাতে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতেছে! মা, তুমি আমাকে এরূপ বিপদে ফেলিয়া কিরূপে নিশ্চিন্ত আছ? মা, এইরূপ বড় বড় বিপদে কতবার পড়িয়াছি, কিন্তু তুমি আমাকে কোলে স্থান দিয়া চক্ষের জল মুছাইয়া দিয়াছ। মা, এবার রক্ষা করিতে বিলম্ব করিতেছ কেন? যদি আমার প্রতি রুষ্ট হইয়া থাক, আমার অনাথ স্ত্রী পুত্রদিগের প্রতি রুষ্ট হইও না। তাহারা যেন দুটী অন্নের জন্য দ্বারে দ্বারে কাঁদিয়া না বেড়ায়।

কেদার নাথ এইরূপে, যখন চক্ষুঃ নিমীলন করিয়া যোড়-করে অতি কাতর ভাবে মা সর্ব্বমঙ্গলার নিকট প্রার্থনা করিতে-ছিল, শোকে বাষ্পবারি বিগলিত হইয়া ধরা অভিষিক্ত করিতে-ছিল, তখন আকারাজের চক্ষু তদুপরি পতিত হইয়া স্থির হইয়া রহিল। আকারাজ কেদার নাথের বধার্থ হুকুম দিবেন কি, তাঁহার চক্ষু বধ্যের মুখে পতিত হইয়া অচল হইয়া গেল। তিনি এরূপ দৃশ্য জীবনে কখন দেখেন নাই, তাঁহার হাত পা অসাড় হইয়া পড়িল। তিনি কেদার নাথের মুখে যে কি সৌন্দর্য্য দেখিলেন, তাহা, যিনি তাঁহার প্রাণরক্ষার্থ অন্তরালে থাকিয়া উপায়োদ্ভাবন করিতেছিলেন কেবল তিনিই জানেন।

আকারাজ কেদারনাথকে যতই দেখেন, ততই তাঁহার মুখের সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইতে লাগিলেন। শেষে স্থির করিলেন, আমার

এইরূপ চিন্তা করিয়া আকারাজ, যাহারা কেদারনাথের বধের জন্য ব্যগ্র হইয়া নৃত্য করিতেছিল, তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তোমরা কাহাকে বাঁধিয়া আনিয়াছ? এ ত সাহেব নয়? আমি সাহেবকে বাঁধিয়া আনিতে বলিয়াছিলাম। ইহাকে বন্ধনমুক্ত কর। আমার কন্যার বিবাহের জন্য পাত্র খুঁজিতেছিলাম, ভগবান্ এত দিন পরে তাহার জন্য সুপাত্র মিলাইয়া দিয়াছেন। ইঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরিষ্কৃত করিয়া দেও। ফলমূলাদি দ্বারা ইঁহার ক্ষুৎপিপাসা শান্ত কর। আমার আসনের ন্যায় আসন আনিয়া দেও। আহা, ইঁহার বড়ই কষ্ট হইয়াছে!!

কেদারনাথের শ্রবণে যখন এই অমৃতবাণী প্রবেশ করিল তখন তাহার নিমীলিত চক্ষু দিয়া প্রবলতরবেগে আনন্দবারি বিগলিত হইতে লাগিল। মা! তুমি সত্য সত্যই আমার দিকে কৃপাদৃষ্টিতে চাহিলে? বধ্যভূমিতে আনীত শ্রীমন্ত তোমাকে কাতর প্রাণে ডাকিয়া যে ফল পাইয়াছিলেন, আজি এই নরাধম তাহাই পাইল! এখন হইতে বুঝিলাম, যে তোমাকে কাতর হইয়া ডাকিতে পারে, তুমি তাহাকে বিপদে ফেলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পার না। আমার রক্ষার জন্য তুমি এ কি উপায় করিলে? আমাকে হস্তীর পদতল হইতে উঠাইয়া সিংহাসনে বসাইলে? ধন্য, মা, তোমার করুণা! ইতিপূর্ব্বে আমি ভয়ে উন্মত্তপ্রায় হইতেছিলাম, এক্ষণে তোমার করুণা আমাকে পাগল করিয়া তুলিতেছে।

কেদারনাথের সমস্ত বিপদ্ কাটিয়া গেল। সে সুমিষ্ট ফলমূলে, ঝরণার শীতল নির্ম্মল স্বাদু সলিলে ও পরিচর্য্যায় সুস্থ হইলে,

রাজা তাঁহার রাণীকে ও কন্যাকে কেদারনাথের অভ্যর্থনার্থ নৃত্য করিতে বলিলেন। রাণী ও রাজকন্যা বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন ও নৃত্য করিতে লাগিলেন। মাদলবাদকগণ মাদল বাজাইতে লাগিল। রাজা মধ্যে মধ্যে কেদারনাথকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "কাহার নাচ ভাল হইতেছে ?" কেদারনাথ প্রথমে বলিলেন, মা রাণীর নৃত্য বড়ই সুন্দর হইতেছে। এই বাক্যে সকলের মধ্যে একটা মহা হাস্য-ধ্বনি উঠিল। কেদারনাথ হাস্যের কারণ কিছুই বুঝিতে না পারিয়া কিছু অপ্রস্তুত হইল। যাহা হউক সমস্ত বিপদ্ কাটিয়া গিয়াছে, এই ধারণায় কেদারনাথ একেবারেই নিশ্চিন্ত হইল।

এদিকে জঙ্গলাধ্যক্ষ সাহেব, আকারা কেদারনাথকে বাঁধিয়া লইয়া গিয়াছে এই সংবাদ পাইয়া গবর্ণমেণ্টকে জানাইবামাত্র, গবর্ণমেণ্ট তৎক্ষণাৎ কিছু সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন। জঙ্গলাধ্যক্ষ সেই সৈন্যসহ আকাদিগের অধ্যুষিত স্থানে উপস্থিত হইয়া রণবাদ্য বাজাইতে লাগিলেন। আকারা যে যেখানে ছিল শশব্যস্ত হইয়া নিভৃত স্থানে পলাইতে লাগিল। কেদারনাথ একাকী পড়িয়া রহিল। জঙ্গলাধ্যক্ষ কেদারনাথকে অক্ষত ও সুস্থ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কেদারনাথ, তোমাকে যে আবার আমরা ফিরাইয়া পাইব, তাহার আশা করি নাই। ভাবিয়াছিলাম তোমাকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া কাটিয়া ফেলিয়াছে ? কিন্তু একি, তোমাকে সম্পূর্ণ সুস্থ ও বিভূষিত দেখিতেছি ? ইহার কারণ বল।

কেদারনাথ একেবারেই নির্ব্বাক, তাহার চক্ষু দিয়া ভক্তিবারি

ঝরিতে লাগিল, সে ঊর্দ্ধদিকে অঙ্গুলি উত্তোলন করিয়া বুঝাইয়া দিল, জগজ্জননী তাহাকে করুণা করিয়াছেন। তাহার নির্ব্বাক্ বদনে জলভরা আঁখি কি স্বর্গের শোভাই ধারণ করিল!

দৃশ্য—অষ্টম।

জিতনেত্রতা ও পিতামহীর সেবা।

পরমারাধ্য ৺মহেশচন্দ্র চূড়ামণি অল্পবয়সে পিতৃমাতৃহীন হন। সেইজন্য তাঁহার পিতামহী তাঁহার প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করেন। সংসারে দ্বিতীয় অভিভাবক না থাকাতে তিনি পৌত্রকে ছাড়িয়া কোথাও তিষ্ঠিতে পারিতেন না। যে সামান্য বিষয় সম্পত্তি ছিল, তাহা দেখিবার কেহ না থাকাতে তাঁহাকেই সমস্ত দেখিতে শুনিতে হইত। দূরের প্রজাদিগের বাটীতে যাইতে হইলে, পৌত্রকে সঙ্গে লইয়া যাইতেন।

পৌত্র যখন বাল্যাবস্থা অতিক্রম করিয়া কৈশোরাবস্থায় উপনীত হইলেন, তখন পিতামহী বার্দ্ধক্য দশায় উপস্থিত। তাঁহার দেহ হ্রাস হইতে লাগিল। তিনি ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইতে লাগিলেন। তাঁহার পরিশ্রমের লাঘবার্থে পৌত্র বিষয়-পর্য্যবেক্ষণের ভার লইলেন। ক্রমে তিনি নবযৌবন দশায় উপনীত হইলেন। বাল্যকাল হইতে রূপবান্ থাকাতে, এক্ষণে নবযৌবনের প্রাদুর্ভাবে অনঙ্গবিজিত রূপ ধারণ করিলেন। তিনি যেমন রূপবান্ তেমনি বলিষ্ঠ হইতে লাগিলেন। তাঁহার আজানুলম্বিত বাহু, সংকীর্ণ মধ্যদেশ, সুবিস্তৃত উরঃস্থল ক্রমে বীরের অঙ্গের ন্যায়

দেখিতে হইল। তাঁহার কমলবিনিন্দিত আনন কুঞ্চিত কেশে সুশোভিত হইয়া সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। সকলে তাঁহাকে দ্বিতীয় গৌরাঙ্গবৎ দেখিতে লাগিলেন।

এই কালে মুড়াগাছার এক জমিদার তাঁহার বিষয় সম্বন্ধে কিছু গোল তুলিয়া তাঁহাকে বিপন্ন করিবার চেষ্টা করেন। সুতরাং বিষয় রক্ষার জন্য বৃদ্ধা পিতামহীকে ফেলিয়া পৌত্রকে পনর ক্রোশ দূরে মুড়াগাছায় যাইতে হইল। একদিনে পনর ক্রোশ পথ চলা তাঁহার পক্ষে কিছুই অসম্ভবপর ছিল না। তিনি যখন পথ চলিতেন তখন পাল্কীবেহারা তাঁহার নিকট হার মানিত।

পৌত্র মুড়াগাছায় উপস্থিত হইয়া জমিদারের সাক্ষাৎকারলাভ করিতে পাইলেন না। সুতরাং যাবৎ সাক্ষাৎ না হয়, তাবৎ তাঁহাকে তথায় অবস্থান করিতে হইয়াছিল।

পৌত্র অত্যন্ত নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ ছিলেন। সন্ধ্যাবন্দনাদিতে তাঁহার অনেক সময় যাপিত হইত। পল্লীগ্রামের নিয়ম, ব্রাহ্মণগণ পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া, ঘাটে বসিয়াই আহ্নিক করেন। মুড়াগাছার জমিদারের একটী সুবৃহৎ সরোবর ছিল। তাহাতে একটী প্রশস্ত সানের ঘাট ছিল। তথাকার নরনারী সেই ঘাটেই স্নান করিত। রমণীগণ কলসী লইয়া তথা হইতে জল আনিত। ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ ঘাটের একপ্রান্তে বসিয়া সন্ধ্যাবন্দনাদি করিতেন।

পৌত্র জমিদারের সাক্ষাৎকারলাভার্থী হইয়া যে কয়দিন তথায় অবস্থান করেন, সেই কয় দিনই তিনি ঐ ঘাটে স্নান

করিতেন ও এক প্রান্তে বসিয়া সন্ধ্যাবন্দনাদি করিতেন। তিনি যখন আহ্নিক করিতেন, তখন তাঁহার চক্ষু নিমীলিত থাকিত। তিনি স্থির দেহে নিমীলিত নয়নে যখন অভীষ্ট দেবতার পূজা করিতেন, তখন তাঁহার মুখে এক অপূর্ব্ব শোভা বিকাশ পাইত। তাঁহার গলদ্বাষ্প সুনীল অক্ষিদ্বয় সজল ইন্দীবরের শোভা ধারণ করিয়া কি যে এক অপূর্ব্ব শ্রী বিধান করিত, তাহা বর্ণনাতীত। তাঁহার প্রশস্ত ললাটের উপরে কুঞ্চিত কেশ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া, তাঁহার মুখচন্দ্রকে সুনীল জলদরাজির মধ্যস্থ শশাঙ্কের শোভা প্রদান করিত।

মুড়াগাছার জমিদারের পত্নী প্রত্যহ ঐ পুষ্করিণীতে স্নান করিতে যাইতেন, এবং বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে এই সুদৃশ্য দেখিয়া আসিতেন। ব্রাহ্মণকুমারের মনোরম দৃশ্যে তিনি দেবভাব দেখিয়া ভক্তিতে গদ্‌গদ হইতেন।

একদিন পত্নী স্বামীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হাঁগা, ঐ যে ব্রাহ্মণ ছেলেটী ঘাটে বসিয়া পূজাহ্নিক করেন, উনি কি কাজের জন্য তোমার কাছে আসিয়াছেন? এমন রূপবান্ ও এমন সমাহিত-চিত্ত ব্রাহ্মণযুবক কখনও নেত্রপথে পতিত হয় নাই। ছেলেটীর কি সংযম! এত স্ত্রীলোক ঘাটে স্নান করিতে যাইতেছে, একবার ভুলিয়াও কি তাহাদের পানে তাকাইতে জানে না? এ ত ব্রাহ্মণকুমার নয়, এ যে সাক্ষাৎ দেবতা। এ যদি তোমা হইতে এক বিন্দু কষ্ট পায়, তোমার সংসার জ্বলিয়া পুড়িয়া ছারখার হইবে। তুমি বিলম্ব না করিয়া তাঁহাকে গৃহমধ্যে আনিয়া পূজা কর, তাঁহার কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া তাঁহার

আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর। তুমি পূর্ব্বজন্মে অনেক তপস্যা করিয়াছ, যে এমন ব্রাহ্মণ তোমার ভদ্রাসন পাদরজঃকণায় পরিপূত করিয়াছেন!

জমিদার পত্নীবাক্যে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ সেই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিতে ছুটিলেন। তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া পত্নী যাহা বলিয়াছিলেন তাহার তথ্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া অশেষ তৃপ্তি লাভ করিতে লাগিলেন, এবং মনে মনে বলিতে লাগিলেন, ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ কেন যে জগৎপূজ্য হইয়াছেন তাহা এতদিনের পরে স্পষ্ট বুঝিতে পারা গেল। আহাহা এ ত মানুষের রূপ নয়, এ যে দেবচিত্র!

ব্রাহ্মণকুমারের পূজাবসানে জমিদার বাবু অতি যত্নসহকারে তাঁহাকে গৃহে আনিয়া ব্রাহ্মণোচিত অন্নপানাদি দ্বারা পরিতৃপ্ত করিলেন, এবং আগ্রহ করিয়া তাঁহার বিষয় সম্পর্কে সুব্যবস্থা করিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণকুমার হৃদয়ের সহিত আশিস্ উচ্চারণ করিয়া সত্বর পিতামহীর উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন।

গৃহে আসিয়া দেখিলেন পিতামহীর উদরপীড়া উপস্থিত হইয়াছে। তখন তিনি নিজহস্তে সমস্ত পরিষ্কার করিতে লাগিলেন। মা যেরূপ ছোটশিশুর বিণ্মূত্রাদি পরিষ্কার করেন, যথাকালে অন্নপানাদি যোগান, পৌত্র ঠিক সেইরূপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার আর অন্য কার্য্য ছিল না। অন্নাদি সংগ্রহ করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে ৫ মাইল দূরবর্ত্তী স্থানে যাইতে হইত, কিন্তু তিনি তথায় বিলম্ব করিতেন না। তাঁহার মন পূজনীয়া পিতামহীর উপরেই পড়িয়া থাকিত। তিনি এত

বেগে চলিতেন যে লোকে মনে করিত তিনি উড়িতেছেন। তৃতীয় শ্রেণীর ঘোড়ার গাড়ি তাঁহার বহু পশ্চাৎ পড়িয়া থাকিত।

যখন পিতামহীর উত্থানশক্তি রহিত হইল তখন পৌত্র কি চমৎকার সেবা করে দেখিবার জন্য পাড়ার লোক সর্ব্বদা তাঁহার গৃহে আসিত। তাহারা সর্ব্বদা বলিত, মা অপোগণ্ড বালককে এত সেবা করিতে পারে না। পৌত্রের গায়ে যথেষ্ট শক্তি থাকাতে অন্য কাহারও সাহায্যের আবশ্যকতা হইত না। তিনি একাকীই সমস্ত কার্য্য করিতেন। গরুর সেবা, রন্ধন কার্য্য, হাটবাজার করা, বাসন মাজা সমস্ত কার্য্যই তিনি একা করিতেন। পাছে পিতামহী কোনও বিষয়ে কিছু অভাব বোধ করেন এই ভয়ে তিনি সর্ব্বদা তাঁহার দিকে চক্ষু কর্ণ ফেলিয়া রাখিতেন। সেবাতে পৌত্রের এই প্রকার তন্ময়ভাব দেখিয়া পল্লীর সমস্ত লোক অবাক্ হইয়া থাকিত, এবং বলিত, এই ব্রাহ্মণ যুবক মানুষ নয়। ইনি দেবতা। যদি ইনি শাপভ্রষ্ট দেবতা না হইবেন, তবে ইঁহার প্রকৃতি দেবসহজ কেন? ইঁহাকে দেখিলে এত আনন্দ হয় কেন? ইঁহার দর্শনে দিন ভাল কাটে কেন? ইনি কাহাকেও আশীর্ব্বাদ করিলে তাহা ফলিয়া যায় কেন?

দৃশ্য—নবম।

গোবৎস রক্ষা ও কন্যকা রক্ষা।

একদিন এক কশাই একটী গোবৎস ক্রয় করিয়া তাহাকে পথ দিয়া লইয়া যাইতেছে, এমন সময়ে তাহার বন্ধন স্খলিত হইল। বাছুরটী অমনি ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে ছুটিতে নিকটে কোন গৃহস্থের বাটীতে প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিয়াই কাঁপিতে কাঁপিতে এক গৃহের কোণে আশ্রয় লইল। বাটীর কর্ত্তা, "কোথা হইতে এই বাছুর আসিল, বিপন্ন ব্যক্তি যেরূপ ভাবে অন্যের আশ্রয় লয়, এ যে সেই ভাবে আশ্রয় লইল!" এইরূপ বলিতে বলিতে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া, কারণ জানিবার জন্য বাহিরে উপস্থিত হইয়া দেখেন, এক কশাই রজ্জুহস্তে বাহিরে অপেক্ষা করিতেছে এবং বলিতেছে, "আমার একটা বাছুর এই বাটীর মধ্যে পলাইয়া গিয়াছে, আপনি আমার বাছুর বাহির করিয়া দিন।"

গৃহস্বামী বলিলেন, "ভাই, এ বাছুরটী বোধ হয় আপনার বিপদ্ বুঝিতে পারিয়াছে, তাহা না হইলে এত কাতর ভাবে আশ্রয় লইবে কেন? তা ভাই, তুমি এ বাছুরটী কত মূল্যে কিনিয়াছ? আমি তোমাকে সেই মুল্য দিতেছি, তুমি বাছুরটী আমাকে বিক্রয় কর।"

কশাই ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "আমি এ বাছুর বিক্রয় করিব না। আমার বাছুর আপনি দিবেন কি না?"

গৃহস্বামী কাতর ভাবে বলিলেন, "ভদ্র, তুমি না হয়

দ্বিগুণ মূল্য লও। বাছুর আমি তোমার হস্তে দিতে পারিব না। যে বিপদের আশঙ্কায় বাছুর কাতর ভাবে আমার আশ্রয় লইয়াছে, সে বিপদে তাহাকে আমি পুনরায় ফেলিতে পারিব না।”

কশাই পুলিশের ভয় দেখাইল, কিন্তু গৃহস্থ অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন। কশাইয়ের সহিত যখন এইরূপ বাগ্‌বিতণ্ডা হইতেছিল, তখন পাড়ার লোকে এই ঘটনা জানিতে পারিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। তাহারা প্রথমে কশাইকে অনুনয় বিনয় করিয়া বলিতে লাগিল, “ওগো বাপু, তোমার কত টাকা চাই বল, তুমি যত টাকা চাহিবে আমরা চাঁদা করিয়া তাহাই দিব। তুমি যদি ৫৲ টাকায় এই বাছুর কিনিয়া থাক, আমরা তোমাকে ৫০৲ টাকা দিতেছি; যাও বাপু, টাকা লইয়া ঘরে ফিরিয়া যাও।”

কশাই এবারে উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া বলিল, আপনারা জানেন, আমি আপনাদিগকে ডাকাইত বলিয়া অভিযুক্ত করিতে পারি? আপনাদের পরদ্রব্য জোর করিয়া রাখা আর ডাকাইতি করা একই কথা।”

কশাই ও পল্লীস্থ ব্যক্তিদিগের মধ্যে যখন এইরূপ বচসা হইতেছিল, তখন যে ব্যক্তি শুনিতে পাইল, অমনি সে আসিয়া তাহাতে যোগ দিতে লাগিল, এবং কশাইকে শেষে তথা হইতে দূর করিয়া দিল।

কশাই পুলিশে গিয়া দারোগার কাছে অভিযোগ করিল। দারোগা কশাইয়ের পক্ষ হইয়া কয়েকটী পাহারাওয়ালা সমেত

তথায় উপস্থিত হইল, এবং জোর করিয়া বাছুর কশাইয়ের হাতে দিবার বাসনা প্রকাশ করিল।

তখন গৃহস্থের আলয়ে শতাধিক লোকের সমাগম হইয়াছে। তাহারা সকলেই প্রথমে করযোড়ে দারোগার নিকট বিনতি করিতে লাগিল, এবং কশাই যত টাকা চাহিবে তাহা দিতে প্রতিশ্রুত হইতে লাগিল, কিন্তু দারোগা তাহাদের বিনতিতে কর্ণপাত না করিয়া ভয় দেখাইয়া বলিল, "দেখ গৃহস্থ, আমি তোমাকে চোর বলিয়া এক্ষণে হাতে হাতকড়া দিয়া পুলিশে লইয়া যাইব এবং ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কোর্টে অর্পণ করিব। যদি ভাল চাও, বাছুর বাহির কর।"

এই বাক্যে সমাগত লোকের ধৈর্য্যচ্যুতি হইল, তখন তাহারা একবাক্যে বলিয়া উঠিল, "এ বাছুর ছাড়িলে আমরা লোকের কাছে মুখ দেখাইতে পারিব না, তাহারা সকলেই বলিবে এ পাড়ায় মানুষ নাই, মানুষ থাকিলে এরূপ একটা বিপন্ন কাতর গোবৎসও রক্ষা করিতে পারিল না! যাও বাছা দারোগা, তোমার যত ক্ষমতা আছে প্রকাশ কর, আমরা বাছুর ছাড়িব না।"

এই বাক্যে দারোগা মহাক্রোধে পাহারাওয়ালাদিগকে হুকুম দিল, "জোর করিয়া গৃহস্থের বাটী প্রবেশ করিয়া বাছুর বাহির করিয়া আন।" পাহারাওয়ালাগণ জোর করিয়া গৃহে প্রবেশ করিতে গেল, কিন্তু তাহারা মুষ্টিমেয় হওয়াতে পারিবে কেন? সকলেই বাধা দিল। এই উপলক্ষে পুলিশ ও গ্রামবাসীদের মধ্যে দাঙ্গা উপস্থিত হইল। এই দাঙ্গায় পুলিশ আহত হইয়া পলাইতে বাধ্য হইল।

ব্যাপার তুমুল হইয়া উঠিল। পুলিস আহত হইয়াছে, রাজার অবমান হইয়াছে, ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব মহাক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি পল্লীর সমস্ত লোককে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন। চারিদিকে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। ম্যাজিষ্ট্রেট্ পুলিসের পক্ষ লওয়াতে দেশের জমিদার বিপন্ন গ্রামবাসীদের পক্ষ অবলম্বন করিতে বাধ্য হইলেন, এবং মকর্দ্দমা চালাইতে যত টাকা লাগে সমস্ত খরচ করিবেন এই আশ্বাসবাক্য প্রদান করিলেন। পুলিসের লোক অপেক্ষা ইহাদের সংখ্যা অত্যধিক হওয়াতে পুলিস বা ম্যাজিষ্ট্রেট্ হঠাৎ কিছু জোর জবরদস্তি করিলেন না।

এই সময়ে বঙ্গাধীশ্বর স্যার্ এশ্‌লি ইডেন্ বঙ্গের স্থানে স্থানে যাইয়া দেশ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। তাঁহার কর্ণে এই সংবাদ পৌঁছিলে, তিনি সেই গ্রামে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া গ্রামের সমস্ত ভদ্র লোককে ও জমিদার বাবুকে আহ্বান করিলেন। এই উপলক্ষে এক বিরাট্ সভা হইল। দেশের ভদ্রাভদ্র সমুদায় লোক বঙ্গেশ্বরের বিচারকার্য্য প্রত্যক্ষ করিবার জন্য অবরুদ্ধশ্বাসে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। বঙ্গেশ্বর আসনে উপবেশন করিলে সকলকে বসিতে বলা হইল। রাজার হুকুমে বাছুরটীকে তথায় আনয়ন করা হইল। যাঁহারা ভাবিতেছিলেন, এইবারে বঙ্গেশ্বর ক্রেতা কশাইয়ের হাতে আশ্রিত বাছুরটীকে সমর্পণ করিবেন, তাঁহারা অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন ও ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন; 'কেমন হে, আশ্রিতের রক্ষার জন্য প্রাণ দিতে

পারিবে ?' তাহারা সকলেই একবাক্যে অশ্রুত ভাবে বলিল, 'হাঁ, দিতে পারিব।'

বঙ্গেশ্বর প্রথমে জমিদার বাবুকে, "রামচন্দ্র !" বলিয়া সম্বোধন করিলেন। রামচন্দ্র বাবুও তৎক্ষণাৎ 'হুজুর'! এই সম্বোধন করিয়া করযোড়ে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ইডেন্ মহোদয় জিজ্ঞাসিলেন, "তুমিও কি পুলিস হইতে বাছুর ছিনিয়া লওয়া ব্যাপারে লিপ্ত আছ ?" জমিদার বলিলেন, "আজ্ঞে হাঁ হুজুর"। বঙ্গেশ্বর চক্ষু রাঙাইয়া বলিলেন, "তুমি জান, এই মুহূর্ত্তেই তোমার জমিদারী কাড়িয়া লইতে পারি !"

এই বাক্যে জমিদারের বিনয়াবনত দেহ যেন তেজস্বিতায় পরিপূর্ণ হইল। তাঁহার চক্ষু দিয়া যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল। তিনি করযোড়ে বলিতে লাগিলেন, "হুজুর ! আপনি কি আমাকে ভয় দেখাইতেছেন! আপনি কি আমাদের পূর্ব্বপুরুষকাহিনী জানেন না ? শিবি রাজা একটী শরণাগত ক্ষুদ্র কপোতকে রক্ষা করিবার জন্য দেহ হইতে সমস্ত রক্তমাংস দান করিয়াছিলেন। আমরা সেই মহাপুরুষদিগের বংশধর হইয়া আজ কি এক জমিদারী কাড়িয়া লইবার ভয়ে, শরণাগত প্রাণী যতই সামান্য হউক, তাহাকে অভয় দিতে পশ্চাৎপদ হইব ? আপনি জমিদারীর কি ভয় দেখাইতেছেন ? এই আশ্রিত বৎস রক্ষার্থ প্রাণ দিব! কেবল আমি একা নহে, তাকাইয়া দেখুন, সমস্ত লোক প্রাণ দিতে দাঁড়াইয়াছেন। বাঙ্গালীকে আপনারা নিবীর্য্য বলিয়া ঘৃণা করেন করুন, কিন্তু ইঁহারা আশ্রিতকে রক্ষা করিবার জন্য যেরূপ বীরত্বের পরিচয় দিতে পারে, তাহা

আপনাদের বোধগম্য হইবার নহে। অগ্রে আমাদের এই সমস্ত লোকের দেহ প্রাণশূন্য করুন, পরে বাছুর লইয়া যান।"

মহাত্মা জমিদার যখন এই অকুতোভয়তা ও তেজস্বিতা-পূর্ণ হৃদয়োন্মাদকারি বাক্য উচ্চারণ করিলেন, তখন তথাকার সমস্ত লোক সমস্বরে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, "হুজুর! আগে আমাদের প্রাণ লউন, পরে বাছুর দুরাত্মা নরাধম কশাইয়ের হস্তে সমর্পণ করুন! এতগুলি লোক যতক্ষণ জীবিত থাকিবে, ততক্ষণ বাছুরকে কিছুতেই কশাইয়ের হাতে যাইতে দেওয়া হইবে না।"

মহোদয় ইডেন্ আশ্রিতরক্ষার্থ বাঙ্গালীর এই অদ্ভুত ব্যগ্রতা প্রত্যক্ষ করিয়া মুগ্ধ হইলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলেন, "এ গোবৎস কশাইয়ের হস্তে সমর্পণ করিলে রাজার কলঙ্ক হইবে।" পরে তিনি সমুপাগত সমস্ত ব্যক্তির বিশেষতঃ জমিদার মহোদয়ের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া কশাইকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ভদ্র, তুমি কিঞ্চিৎ অধিক মূল্য লইয়া অন্য বাছুর কিনিয়া লও। এতগুলি লোকের প্রাণে ব্যথা দিয়া তোমার এ আবদার শুনিতে পারা যায় না।"

এই বাক্যে চারিদিকে আনন্দের ধ্বনি উঠিল। সকলেই বলিয়া উঠিল, "জয়, স্যার্ এশ্‌লি ইডেন মহোদয়ের জয়! জয়, ইংরাজ-রাজত্বের জয়! আজ আমরা ইংরাজ-রাজ্যে বাস করিয়া, ধন্য হইলাম!!"

মহাত্মন্ জমিদার রামচন্দ্র, আজ তুমি বীরত্বের কি চিত্রই দেখাইলে! তোমার এবং তোমার গ্রামস্থ প্রজাবৃন্দের আশ্রিত-রক্ষার্থ প্রযত্নের মধ্য দিয়া আজ যে বীরত্ব প্রকাশিত হইল, তাহাতে

আর্য্যজাতির মুখ আবার সমুজ্জ্বল হইল। বাঙ্গালী জাতি যে বড়ই উচ্চ জাতি, তাহার যথেষ্ট পরিচয় দিলে। অন্যান্য জাতি বাঙ্গালীকে নির্বীর্য্য বলিয়া যতই ঘৃণা করুক, পরের বিপদে বাঙ্গালীরা যে অতুল্য বীর, তাহা স্পষ্টই দেখাইয়া দিলে।

মহোদয় রামচন্দ্র! তোমার ন্যায় সেদিন একটী বাঙ্গালী যুবক একটী ভদ্রবংশের বালিকাকে বিপন্ন দেখিয়া যে বীরত্ব দেখাইয়াছে, তাহা স্মরণ হইলে মনে হয়, তোমার পদানুসরণকারী বহু বাঙ্গালী বাঙ্গালা দেশকে পৃথিবীর সমস্ত দেশের শীর্ষস্থানে বসাইতে পারিয়াছে। কলিকাতা সার্‌কুলার্ রোড দিয়া একটী ভদ্রবংশীয়া কন্যা বাটীর মোটরগাড়ীতে আসিতেছিলেন। পথে মোটরের চাকা খুলিয়া যাওয়াতে চালক তাহার সংস্কারার্থ স্বল্পদূরবর্ত্তী এক দোকানে একটা জিনিস আনিতে যায়। এই সময়ে এক শ্বেতাঙ্গ পুরুষ মদমত্ত হইয়া বালিকাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হয়। বালিকার কাতর ধ্বনি এক পথিক বাঙ্গালী যুবকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। তিনি তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া আসিয়া শ্বেতাঙ্গকে ভৎর্সনা করিলেন, কিন্তু তাহাতে ফলোদয় না হওয়াতে তাহাকে আক্রমণ করিতে বাধ্য হইলেন। দুই জনে ঘুসাঘুসি চলিতে লাগিল। এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিবার জন্য চারিদিকে লোক সমবেত হইল। অল্পক্ষণমধ্যেই ঐ পাষণ্ড শ্বেতাঙ্গ বাঙ্গালীর পদাবনত হইয়া পড়িল। সকলে "বাঙ্গালীর জয়, পরের বিপদে বাঙ্গালীরা তাহাদের দেবতা চামুণ্ডাদেবীর শক্তি লাভ করে," বলিয়া মহা হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিল।

ভদ্রবংশীয়া কন্যা আসন্ন বিপদ্ হইতে রক্ষা পাইয়া তাঁহার

অঙ্গুলীতে যে বহুমূল্য অঙ্গুরীয় ছিল, তাহা উন্মোচন করিয়া বীর যুবককে পুরস্কারস্বরূপ দিতে যাইলেন। যুবক মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন, "ভগিনি, আমি অন্যপুরস্কার-প্রার্থী নহি, চাহি কেবল আশীর্ব্বাদ। আশীর্ব্বাদ কর, যেন এইরূপ পরবিপদে 'বাঙ্গালীর ন্যায় বীর পুরুষ আর নাই' ইহা জগৎকে দেখাইতে পারি।"

মহাত্মন্ রামচন্দ্র! তোমরা আজ সত্য সত্যই দেখাইলে, বাঙ্গালী সাধু কার্য্যানুষ্ঠানেই বীর, পরের দ্রব্য অপহরণে একেবারেই নির্বীর্য্য। অসদনুষ্ঠানে তাহাদের হাত পা অসাড় হইয়া পড়ে, কিন্তু তাহারা পরবিপদে সিংহবিক্রম ধারণ করিয়া অপূর্ব্ব শ্রী লাভ করে।

দৃশ্য—দশম।

অবমানে অগণনা।

চব্বিশ পরগণায় কোনও এক গণ্ডগ্রামে এক ভদ্রবাটীতে দেশের সকলে নিমন্ত্রিত হইয়া মধ্যাহ্নে উপস্থিত হন। সমাগত ব্যক্তিদিগের মধ্যে নানাবিধ কথাবার্ত্তা হইতেছে এমন সময়ে যদুনাথ চক্রবর্ত্তী নামে এক সর্ব্বপরিচিত ব্রাহ্মণ উপস্থিত হইয়া একটী ব্রাহ্মণ যুবকের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "ইনি নিমন্ত্রিতদিগের মধ্যে আসীন কেন? ইনি ব্রাহ্মসমাজে যখন যাতায়াত করেন, তখন ইনি এখানে নিমন্ত্রিত হইয়াছেন কেন? ইঁহার সঙ্গে আমরা আহার করিতে পারি না। ইনি

এখান হইতে এক্ষণেই প্রস্থান করুন, নতুবা আমরা সকলে চলিয়া যাইব।"

যদুনাথের এই কর্কশ বাক্যে সমুপাগত সমস্ত ভদ্রলোকের মাথা হেঁট হইল। তাঁহারা বলাবলি করিতে লাগিলেন, "যদুনাথ কেমন করিয়া এই কঠোর ভাষা মুখ হইতে বাহির করিতেছে? এই ব্রাহ্মণ যুবক ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করেন বটে, কিন্তু ইনি ত হিঁদুয়ানি ছাড়েন নাই, ইনি ত উপবীত ত্যাগ করেন নাই। ব্রাহ্মসমাজে বসিয়া ভগবান্‌কে ডাকিলে কি সে হিন্দুসমাজে পতিত হয়? ইঁহার বাটীতে শালগ্রাম শিলার পূজা হয়। ঠাকুরের অন্ন নিবেদন না হইলে ইঁহারা ভোজন করিতে পান না। যদুনাথ কাহার প্রতি এরূপ অবমানসূচক ভাষার প্রয়োগ করিতেছে!!" শেষে তাঁহারা যদুনাথের প্রতি এত অসন্তুষ্ট হইলেন ও বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন যে, অবমানিত ব্রাহ্মণ যুবক আর নিস্তব্ধ থাকা উচিত মনে করিলেন না। তিনি মৃদু মৃদু হাস্যে ও বিনয়বাক্যে তাঁহাদিগকে আশ্বস্ত করিয়া বলিতে লাগিলেন, "ভ্রাতৃবৃন্দ, তোমরা যদুনাথের ভিতরের খবর না জানিয়া একেবারেই বিরক্ত হইয়া উঠিও না। যদুনাথ আমার একজন বাল্যবন্ধু, উনি আমাকে হৃদয়ের সহিত ভাল বাসেন। উহাঁর যখন ইষ্টকের ব্যবসায় ছিল, তখন ইষ্টকের অভাবে আমার নূতন পাকাবাটী সম্পূর্ণ হইতেছে না দেখিয়া আমাকে বিনা মূল্যে হাজার ইট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। ইহাতেই বুঝিয়া লও, যদুনাথ আমাকে মনে মনে কত ভাল বাসেন! তবে যে এক্ষণে এমন কঠোর ভাষা প্রয়োগ করিতেছেন, তাহার

কারণ আর কিছুই নয়, উনি দেখিতে চান, আমার ধৈর্য্য নাশ হয় কি না ?

এক ধনী মুসলমান এক প্রসিদ্ধ ফকিরের ধৈর্য্য পরীক্ষা করিবার জন্য কতকগুলি ভদ্র মুসলমানকে নিমন্ত্রণ করেন ও সেই সঙ্গে ঐ ফকিরকেও সযত্নে আহ্বান করেন। ফকির নিমন্ত্রিত হইয়া যথাসময়ে আহারার্থ মুসলমান-ভবনে উপস্থিত হইলে, উক্ত গৃহস্থ ফকিরকে অবজ্ঞাসূচক ভাষায় বলিলেন, "ফকির, তুমি এখানে কেন ?" ফকির বলিলেন, "মহাশয়, আপনার লোক্ আমাকে নিমন্ত্রিত করিয়াছেন।" গৃহস্থ কঠোর বাক্যে বলিলেন, "কোন্ মহামূর্খ তোমাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছে ? সে ত বড়ই নির্ব্বোধ দেখিতেছি। এতগুলি ভদ্র মুসলমানদিগের মধ্যে কিনা এক ফকিরের আসন ? তোমার যদি আহার করিবার এত সাধ থাকে, তবে আর একদিন একা আসিও। ভদ্রলোকদিগের মধ্যে তোমাকে বসিতে দিতে পারিব না।" ফকির কোনও উত্তর না দিয়া সহাস্যবদনে প্রস্থান করিলেন। ফকির কিছু দূর না যাইতে যাইতেই গৃহস্থ তাঁহাকে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "ফকির, যখন আহারের সময়ে আসিয়াছ, তখন বাহির বাটীতে বসিয়া কিছু উদরস্থ করিয়া যাও।" ফকির পূর্ব্ববৎ সহাস্যবদনে গৃহস্থের অভিমুখে ফিরিলেন এবং বাহির বাটীতে উপবেশন করিলেন। গৃহস্থ চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ফকির মহোদয় ! আপনাকে অবমানিত করিয়া তাড়াইয়া দিলেও আবার যে এই দীনের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া ফিরিলেন ? এই প্রত্যগ্র অবমান-বাক্য কি করিয়া ভুলিলেন ?" তখন মহাত্মা

ফকির বিনয়ালঙ্কৃত সস্মিত বাক্যে বলিতে লাগিলেন, "মহাশয়, আপনি আমাকে কি কুকুরেরও অধম করিতে চান? একটা কুকুরকে আহ্বান করিয়া যদি তাহাকে প্রহার করিয়া তাড়াইয়া দেওয়া যায়, তবে পুনরাহ্বানে সে কি পূর্ব্ব তাড়না ভুলিয়া গিয়া তৎক্ষণাৎ আইসে না? কুকুর অতি ক্ষুদ্র প্রাণী হইয়াও যদি এত সহজে আত্ম অবমান ভুলিতে পারে, তখন আমি মানুষ হইয়া এই অবমানটুকু ভুলিতে পারিব না?"

ফকিরের এই মহাবাক্যে গৃহস্থের চক্ষে জল আসিল। তিনি ফকিরের চরণ ধরিয়া ক্ষমা চাহিয়া বলিলেন, "সাধো, আপনি যে অনন্যপ্রকৃতিক লোক, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্যই এইরূপ কঠোর ভাব প্রকাশ করিয়াছি। আপনি আমাদের শিরোদেশে বসিবার যোগ্য। আসুন, আপনি পাদরজঃ দ্বারা আমার গৃহ পবিত্র করুন।"

যদুনাথ আমার প্রতি যে কর্কশ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা কেবল আমার ধৈর্য্য-পরীক্ষার্থই করিয়াছেন। অন্যথা যে পূর্ব্বে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এত সাহায্য করিয়াছে, সে কি কখন এই ভদ্র-সমাজে এরূপ কর্কশ ব্যবহার করিতে পারে? এই বাক্যে বহু ভদ্র লোকের ভ্রুকুটীকুটিল মুখ আবার প্রসন্নভাব ধারণ করিল; আবার ক্রোধবিজিহ্ম মুখে মৃদুহাস্য দেখা দিল। পূর্ব্ব কুদৃশ্য একেবারেই সুদৃশ্যে পরিণত হইল। সকলেই ব্রাহ্মণ-কুমারের মৃদুমধুরস্মিতবদনে একদৃষ্টে চাহিয়া কি এক মনোরম ভাব প্রত্যক্ষ করিতে লাগিল।

দৃশ্য—একাদশ।

বিমাতা।

কলিকাতায় কোনও এক প্রসিদ্ধ ভদ্রপল্লীতে এক ভদ্র যুবক বাস করিতেন। তিনি এক ইংরাজ সওদাগরের বাটীতে কাজ করিতেন। তিনি সেখানে যে বেতন পাইতেন, তাহাতে তাঁহার সংসার সচ্ছলে চলিত। তিনি যথাকালে বিবাহ করেন ও একটী সুশ্রী বলিষ্ঠ বুদ্ধিমান্ পুত্রসন্তান লাভ করেন। ছেলেটীকে যথাসময়ে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থ প্রেরণ করেন ও যাহাতে তাহার সুশিক্ষা হয়, নিজে তাহার তত্ত্বাবধান করেন। পত্নী নানাগুণে ভূষিতা থাকাতে যুবক আপনাকে সুখী মনে করিতে লাগিলেন। কিন্তু শীঘ্রই এ সুখের অবসান হইল। পত্নী কঠোর পীড়ায় দেহত্যাগ করিলেন। পিতা পুত্রটীর লালন পালন কিরূপে করিবেন এই ভাবনায় কাতর হইলেন। শেষে বন্ধুবান্ধবদিগের পরামর্শে পুত্রের রক্ষণাবেক্ষণার্থ দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করিলেন। ভাবিয়াছিলেন, দ্বিতীয় পত্নী দ্বারা পুত্রের সমস্ত অভাব বিদূরিত হইবে, কিন্তু তাহা হইল না। বিমাতা সপত্নীতনয়কে বিষদৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন। পুত্রের কোথায় সুবিধা হইবে, তাহা না হইয়া কষ্টের বৃদ্ধি হইতে লাগিল। বিশেষতঃ বিমাতার কয়েকটী সন্তান হওয়াতে, জ্যেষ্ঠ পুত্রের দুঃখের পরিসীমা রহিল না। পিতা পুত্রের কষ্ট অনেক সময়ে প্রত্যক্ষ করিয়া পত্নীকে বুঝাইয়া বলিতেন, "দেখ গৃহিণি, এটী তোমার সপত্নীতনয় হইলেও তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্র।

আমার শরীরের ভদ্রাভদ্র হইলে এই ছেলেই তোমার ও তোমার গর্ভজাত এই অপোগণ্ড পুত্রদের অভিভাবক হইয়া তোমাদের আশ্রয় হইবে। ইহার প্রতি অযোগ্য ব্যবহার না করিয়া ভদ্র ব্যবহার করিলে তোমারই মঙ্গল।"

স্বামীর এ সকল কথায় পত্নী আরও দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিতেন; তিনি বলিতেন, "যদি সতীনছেলের হাতে আমাকে কখন পড়িতে হয়, সে দিন গলায় দড়ি দিব। সতীনের ছেলে ত শত্রু। শত্রুর হাতে পড়া আর মরা একই কথা।" স্বামী বলিলেন, "তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্র বহুগুণধর, 'এ তোমার শত্রু,' এ ধারণা তোমার কিরূপে হইল ? তুমি ইহার প্রতি যে সকল অপ্রীতিকর ব্যবহার কর, তাহাতে আমার চক্ষে জল আসে, কিন্তু পুত্র ত তাহা গণনাই করে না। সে তোমাকে অসদ্ব্যবহারের পরিবর্ত্তে যে আদর যত্ন করে, তাহাতে আমরা অবাক্ হইয়া যাই।"

পত্নী এই বাক্যে ক্রোধে দ্বিগুণিত উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া বলিলেন, "তোমার বহুগুণধর পুত্র তোমারই থাকুক, আমি শত্রুকে দুই চক্ষে দেখিতে পারিব না।" পিতা নির্জ্জনে বহু অশ্রুবর্ষণ করিলেন, শেষে ভগবানের হস্তে পুত্রের ভার সমর্পণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "ঠাকুর! তোমার জিনিস তুমিই রক্ষা করিও।"

কালে জ্যেষ্ঠ পুত্র যৌবনপদবীতে আরোহণ করিল ও সুশিক্ষায় কার্য্যক্ষম হইয়া উঠিল। এই সময়ে পিতা মানবলীলা সংবরণ করিলেন। ইংরাজ সওদাগর সুশিক্ষিত জ্যেষ্ঠ পুত্রকে আহ্বান করিয়া তাহারই হস্তে পিতার কার্য্যভার সমর্পণ করিলেন।

ইহাতে সংসারে অর্থাগম সমভাবে থাকাতে সাংসারিক কোনও অভাব উপস্থিত হইল না। বিমাতা সপত্নীপুত্রের সম্পূর্ণ অধীন হইয়া পড়িলেন। তিনি মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন "হা ভগবন্! শেষে তুমি আমাকে শত্রুর হাতেই ফেলিলে? আমি বিষ খাইব, না, গলায় দড়ি দিব? আমার এক্ষণে মরা উচিত, কিন্তু আমি মরিলে আমার এই শিশু নিরাশ্রয় সন্তানদিগের কি দশা হইবে?"

বিমাতা অপার চিন্তায় পড়িলেন, ভাবিতে লাগিলেন, এই-বারে আমার সতীনের ছেলে আমার কর্কশ ব্যবহারের প্রতি-শোধ তুলিবে। হা বিধাতঃ! তোমার মনে এই ছিল!

পিতা যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন তিনি স্বোপার্জিত অর্থ নিজের হাতেই রাখিতেন ও স্বয়ং সংসার খরচ করিতেন। বিমাতার যদি কখনও কিছু অর্থের প্রয়োজন হইত, চাহিয়া লইতেন।

ইংরাজ সওদাগর, পুত্রের কার্য্যকলাপে সন্তুষ্ট হইলেন, এবং পিতা যে বেতন পাইতেন, মাসান্তে পুত্রের হস্তে সেই বেতনই প্রদান করিলেন। পুত্র প্রথম মাসের বেতন পাইয়া বিমাতৃ-সন্নিধানে করযোড়ে উপস্থিত হইল ও সম্বোধন করিয়া বলিল, "মা! পিতা যে বেতন পাইতেন, সাহেব পূর্ণমাত্রায় তাহাই দিয়াছেন। বাবার এ টাকা তোমারই। বাবার যে ক্যাশবাক্স ছিল, তাহা তোমারই হইয়াছে। তুমি আগে কেবল আমার মা ছিলে, এখন তুমি আমার মা বাপ দুই হইয়াছ। তোমাকে এখন হইতে মায়ের কাজ ও বাপের কাজ—এই দুই কাজই করিতে হইবে।" এই বলিয়া ক্যাশ বাক্স আনিয়া তাহাতে বেতনের

সমস্ত টাকা পূরিয়া, বিমাতৃ-হস্তে সমর্পণ করিল ও বলিতে লাগিল, "মা, তুমি আমাকে এখন হইতে কেবল পুত্র ভাবিও না, আমাকে সর্ব্বদা ভৃত্য ভাবিও। যখন যাহা প্রয়োজন হইবে, ভৃত্যকে যেরূপ আদেশ করিতে হয়, সেইরূপ আদেশ করিও। যদি তোমার আজ্ঞা পালন করিতে বিলম্ব হয়, তিরস্কার করিও। আমার ছোট ছোট ভাইগুলির ও তোমার নিজের কোনও কষ্ট হইলে তাহা আমার মর্ম্মান্তিক হইবে, এইটী যেন সর্ব্বদাই মনে থাকে।"

বিমাতা সপত্নীতনয়ের এই কর্ণামৃত বাক্যে অশ্রুধারা আর সংবরণ করিতে পারিলেন না। আনন্দাশ্রু তাঁহার দুই গণ্ড ভাসাইয়া ফেলিল। তিনি ভগবান্‌কে ধন্যবাদ দিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন, ঠাকুর, এ কি চিত্র দেখাইলে! আমি স্বামিধন হারাইয়া চারিদিক্ অন্ধকার দেখিতেছিলাম, এক্ষণে তুমি আমাকে এমন এক উপযুক্ত পুত্রের হস্তে সমর্পণ করিলে যে, আমার সমস্ত ভাবনা দূর হইয়া গেল! আমি যাহাকে শত্রু ভাবিয়া তাহার মনে কতই কষ্ট দিয়াছি, সেই আমার সমস্ত দুঃখানলে জল ঢালিয়া দিল! এ ত মানুষ নয়, এ যে নিশ্চয়ই শাপভ্রষ্ট দেবতা! আগে যাহার চলন, কথন, উপবেশন কিছুই ভাল বোধ হইত না, এখন দেবসহজ গুণ তাহাকে কি এক অঙ্গরাগ মাখাইয়া দিয়াছে, এমন সুশ্রী রূপ ত আর দেখি না!!

দৃশ্য—দ্বাদশ।

আতুরের সেবা।

চব্বিশ পরগণায় রাজপুর গ্রামে গিরিশ বিদ্যারত্ন ফণ্ড নামে একটী ফণ্ড অনাথ দরিদ্রদিগের সাহায্যার্থ স্থাপিত আছে। বিদ্যারত্ন মহাশয়ের প্রদত্ত অর্থে ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র পণ্ডিত হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন মহাশয়ের প্রদত্ত অর্থে, এমন কি তাঁহার এক কন্যার ও এক প্রতিবেশিনীর অর্থে ফণ্ডটীতে এক্ষণে ত্রয়োবিংশতি সহস্র মুদ্রা সঞ্চিত হইয়াছে। এই অর্থের সুদ হইতে নিরাশ্রয়দিগকে সাহায্য দান করা হয়।

রাজপুরে এক মুসলমান বৃদ্ধা নিরাশ্রয়া রমণী, এই ফণ্ড হইতে বৃত্তি পাইত। ইহাতে তাহার এক প্রকার জীবিকানির্ব্বাহ হইত। বৃত্তির টাকাটা এক মুসলমান প্রতিবেশিনীকে দেওয়া হইত, সে দুই বেলা দুই মুটা অন্ন দিত। এইরূপে মুসলমান বৃদ্ধার দিনাতিপাত হইতে লাগিল।

কিছুদিন পরে বৃদ্ধার রক্ত-আমাশয় রোগ দেখা দিল। সে চলচ্ছক্তিহীন হইয়া শয্যা গ্রহণ করিল। যে মুসলমান প্রতিবেশিনী তাহাকে অন্ন দিত, সে অন্নই দিত, আর কিছুই করিতে চাহিত না। আমাশয় রোগীর পরিচর্য্যা বিশেষ প্রয়োজনীয় হইলেও সে বৃদ্ধার দিকে চাহিয়াও দেখিত না। কেবল আহারের সময় দুটী অন্ন আনিয়া বৃদ্ধার সম্মুখে রাখিয়া যাইত। বৃদ্ধা খাইল, কি কুক্কুর বিড়াল খাইল, তাহার সংবাদ লইত না।

বৃদ্ধা পরিচর্য্যার অভাবে বড়ই কষ্ট পাইতে লাগিল। সে

বিণ্মূত্রপূরিত শয্যাতেই দিন রাত্রি পড়িয়া থাকিত। তাহার ক্লেশের অবধি রহিল না।

বিদ্যারত্ন ফণ্ডের অভিভাবকেরা বৃদ্ধা অনাথা মুসলমান রমণীর রোগের কথা শুনিতে পাইয়া তথায় উপস্থিত হইল, এবং তাহার প্রতিবেশিনীকে উহার পরিচর্য্যার্থ বহু অনুনয় বিনয় করিল, কিন্তু তাহাদের কথা ভাসিয়া গেল। শেষে অগত্যা ফণ্ডের অভিভাবকদ্বয় তাহার শুশ্রূষাকার্য্যের ভার নিজ হস্তে লইল এবং "বাম হস্ত যেন দক্ষিণ হস্তের কাজ না জানিতে পারে" এই মহাজনের মহাবাক্য অনুসরণ করিয়া সকলের অগোচরে রাত্রিকালে তাহার পরিচর্য্যা করিয়া আসিত। তাহার বিণ্মূত্র-পূরিত বস্ত্র শয্যাদি পুষ্করিণীর জলে কাচিয়া শুকাইবার ব্যবস্থা করিয়া আসিত। আমি নগণ্য ব্যক্তি, আমার বিণ্মূত্র বামনের ছেলে ঘাঁটে, এই কথা যখনই মনে পড়িত তখনই সেই মুসলমান রমণী অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িত। কিন্তু ভদ্রসন্তানেরা তাহাকে বুঝাইয়া বলিত, "মা, তুমি সঙ্কোচ কর কেন? এদুটী তোমারই সন্তান। এ জন্মে না হউক, আর জন্মে হয় ত আমরা তোমার সন্তান ছিলাম, তাহা না হইলে ভগবান্ একাজে আমাদিগকে ব্রতী করিবেন কেন? ছেলেরা বেঁচে থাকিতে মায়ের কষ্ট পাওয়া উচিত নয় ভাবিয়া ভগবান্ আমাদিগকে এই সাধু প্রবৃত্তি দিয়াছেন। মা তুমি একটুও সঙ্কোচ করিও না, আমরা নিশ্চয়ই তোমার সন্তান ছিলাম।" যখন ফণ্ডের অভিভাবকদ্বয় এইরূপ প্রবোধবাক্য প্রয়োগ করিয়া বৃদ্ধার সঙ্কোচ বিদূরিত করিল, তখন বৃদ্ধার মুখ সলিলধারায় আপ্লুত শুষ্ক পদ্মের আকার

ধারণ করিল। মুখে কি যে এক আনন্দের চিহ্ন বিকাশিত হইল, তাহা অবর্ণনীয়। সমুপাগত অভিভাবকদ্বয় সে চিত্র অনেক দিন ভুলিতে পারে নাই। বৃদ্ধার সেই আনন্দময় মুখখানি যে মনোরম আকার ধারণ করিয়াছিল, তাহা দেখিয়া ঐ দুই অভিভাবক পরস্পর বলিতে লাগিল, "আমরা ইহার যে সেবা করিতেছি, ইহার হৃদয়ের পরম তৃপ্তিবিকাশক মুখের ভাব তাহার প্রতিদান করিল।

দৃশ্য—ত্রয়োদশ।

পিতৃদর্শন।

হরিনাভি-নিবাসী অধ্যাপক মতিলাল ভট্টাচার্য্য এম্, এ, এল্‌বার্টকলেজের অধ্যাপকের পদ পরিত্যাগ করিয়া আগরা-কলেজের অধ্যাপক হইলেন। তাঁহার বেতন তিনগুণ বৃদ্ধি পাইল। তাঁহার সংসারে অর্থের সচ্ছলতা হওয়াতে সাংসারিক বহু দুঃখ নিবারিত হইল। কিন্তু তাঁহার একটী দুঃখ বাড়িয়া গেল। তাঁহার মাতা ছিলেন না, পিতা বর্ত্তমান ছিলেন, তাঁহাকে ফেলিয়া বিদেশে যাইতে হইল। এতদিন সংসারে অপ্রতুল হেতু বহু কষ্ট ছিল, কিন্তু এই একটা সুখ ছিল, পিতাকে দুই বেলাই দেখিতে পাইতেন। এক্ষণে পিতৃ-চরণ দর্শন বহু দিনের জন্য বন্ধ রহিয়া গেল। বৎসরান্তে তিনমাস গ্রীষ্মাবকাশ ভিন্ন অন্য সময়ে পিতৃ-চরণ দর্শন আর ঘটিয়া উঠিত না। নয়মাস তাঁহাকে দিন গণিতে হইত।

আগামী মাসে গ্রীষ্মাবকাশ হইবে, এই আনন্দে মতিলাল উদ্যোগ আরম্ভ করিলেন। পিতা যে যে দ্রব্য ভাল বাসেন, তাহা সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। দিনের পর দিন চলিয়া যাইতে লাগিল। 'দেশে গিয়া পিতৃচরণে প্রণাম করিতেছি' ইত্যাদি স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। শেষে, পরশ্বঃ গ্রীষ্মাবকাশ হইবে, কল্যই দেশে যাইবার জন্য যাত্রা করিতে হইবে, এক দিনও নষ্ট করা হইবে না, ইত্যাদি ব্যবস্থা হইতে লাগিল।

আগ্রাকলেজের অন্যতম অধ্যাপক রামনাথ বাবুও দেশে আসিবেন। দুই জনে এক সঙ্গে আসিবেন, এইরূপ কল্পনা ছিল, কিন্তু তাঁহার আগমনে ব্যাঘাত পড়িয়া গেল। মতি-লাল কলেজের অবকাশবিজ্ঞপ্তি পাইয়া রামনাথ বাবুকে বলিলেন, "কৈ রামনাথ বাবু, আপনি বাড়ী যাইবেন না?"

রামনাথ বাবু বিষণ্ণবদনে বলিলেন, "মতিবাবু! পাঁজি খুলিয়া দেখিলাম, আজ দিনটা বড়ই অশুভ। এ দিনে যাত্রা করিতে কিছুতেই সাহস হইতেছে না।"

মতিলাল বলিলেন, "আমি পিতৃদর্শনার্থ যাত্রা করিতেছি। দেব দর্শনে দিনক্ষণ মানিতে নাই। আমি আজই এই বৈকালের ট্রেণেই উঠিব, আপনি ভাল দিন দেখিয়া যাইবেন।"

মতিলাল সপরিবারে সত্বর ট্রেণে উঠিলেন এবং অবাধে কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রামনাথ বাবু ভাল দিন দেখিয়া বাহির হইলেন বটে, কিন্তু ঘটনাচক্রে নানা বাধা বিপত্তিতে পড়িয়াছিলেন। মতিলাল দেবদর্শনার্থ ব্যগ্র, কুদিনে যাত্রা করিলেও তাঁহার কাছে কি বাধা বিপত্তি আসিতে পারে?

মতিলাল কলিকাতায় যখন উপস্থিত হইলেন, তখন ই, বি, ষ্টেট্ রেলওয়েতে হরিনাভি যাইবার কোনও ট্রেণ ছিল না। কলিকাতা হইতে হরিনাভি যাইবার ট্রেণ ধরিতে হইলে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হয়। মতিলাল কলিকাতায় আসিয়া ছয় ক্রোশ দূরবর্ত্তী হরিনাভি গ্রামে যাইতে কি আর কালবিলম্ব করিতে পারেন? তিনি ঘোড়ার গাড়ীর ব্যবস্থা করিলেন।

ঘোড়ার গাড়ী যতই বাটীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল, ততই পিতৃদর্শন-স্পৃহা বলবতী হইতে লাগিল। মনে মনে নানা চিত্র আঁকিতে লাগিলেন।

এদিকে মতিলালের পিতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক দিননাথ ন্যায়রত্ন মহাশয় পথ চাহিয়া মতিলালের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া আছেন। সময় যতই যাইতে লাগিল, ততই কেবল ঘর বাহির করিতে লাগিলেন। তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "ট্রেণে আসিতে হইলে চারি ঘণ্টা বিলম্ব করিতে হয়। আমার গুণধাম পুত্র মতিলাল আমাকে দেখিবার জন্য যেরূপ কাতর হয়, সে কি ট্রেণের জন্য চারি ঘণ্টা অপেক্ষা করিবে? সে হয় ত এই চারি ঘণ্টা সময় অতিবাহিত করিতে অসমর্থ হইয়া বহুব্যয়সাধ্য দুইখানি ঘোড়ার গাড়ী করিয়া আসিতেছে। আমি পথে গিয়া দাঁড়াই।"

পিতা বহুদিনের পর পুত্র, পুত্রবধূ, পৌত্রাদি সমেত মতিলালকে আবার দেখিতে পাইবেন, এই আশায় পথের ধারে দাঁড়াইয়াছেন, এমন সময় ঘোড়ার গাড়ীর শব্দ তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। "এ গাড়ীতে কি মতিলাল আসিতেছে?" এই ভাবিয়া

স্বদৃশ্য বা বঙ্গের রত্নমালা ৩য় ভাগ

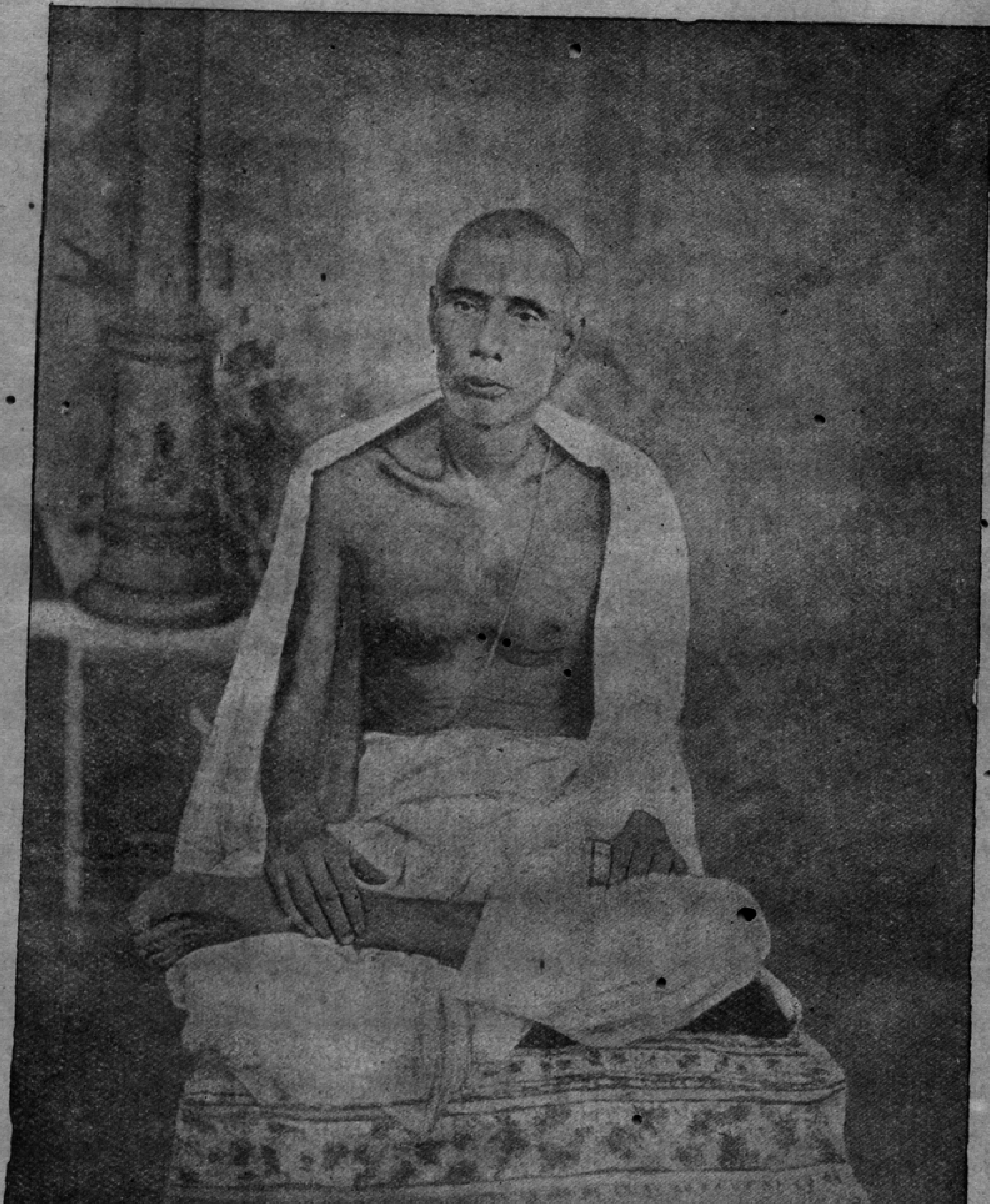

পণ্ডিত দীননাথ ন্যায়রত্ন

যেমন সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, অমনি দেখিতে পাইলেন, মতিলাল পিতৃদর্শনার্থ লালায়িত হইয়া গাড়ী হইতে মুখ বাহির করিয়া বসিয়া আছেন। চারি চক্ষু এক হইবামাত্র উহা আনন্দ-জলে ভরিয়া গেল। পুত্র সত্বর শকট হইতে অবতরণ করিয়া পিতৃচরণ বন্দনা করিলেন, পিতা পুত্রকে বুকে করিয়া লইলেন। উভয়ের মুখে বাক্য নাই, কেবল অশ্রুধারা। ভগবন্! তোমার এই বাহ্য জগতে বহু সুদৃশ্য সৃষ্টি করিয়াছ, কিন্তু এ দৃশ্য তোমার সমস্ত বাহ্য দৃশ্যকে পরাজিত করিল, তুমি এ কি দৃশ্যই দেখাইলে! ইহার যে তুলনা পাই না!!

বঙ্গদেশে এই দৃশ্য প্রায়ই ঘরে ঘরে দেখিতে পাওয়া যায়। হরিনাভি-নিবাসী পূজ্যপাদ উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ফুল বিল্বপত্র দিয়া তাঁহার জননীর চরণ পূজা করিতেন। যদি কোনও দিন জননীর দর্শন না পাইতেন সেদিন মাতৃচরণ অঙ্কিত করিয়া তাহা পূজা করিতেন। মাতৃচরণ পূজা না করিয়া কিছুতেই জল গ্রহণ করিতেন না। স্মরণ হয়, একটী যুবক কর্ম্মক্ষেত্রে যাইবার সময় পিতৃচরণ বন্দনা করিয়া যাইতেন এবং প্রতিনিবৃত্ত হইয়া মনোমত উপহার প্রদানানন্তর পিতৃপাদপদ্মে প্রণাম না করিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতেন না। কর্ম্মস্থান হইতে ফিরিতে কখন কখন রাত্রি হইত। এক দিন রাত্রি একটু অধিক হওয়াতে পিতা ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন। পুত্র ঘর্ম্মসিক্ত-বেশে উপহারহস্তে চরণপ্রান্তে নির্নিমেষ-লোচনে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ঘুম ভাঙ্গাইলে পিতার কষ্ট হইবে এই চিন্তায় আত্মক্লেশ বিস্মৃত হইয়া করযোড়ে অবিচলিত দেহে বহুক্ষণ

দণ্ডায়মান রহিলেন। কি সুদৃশ্য! এ দৃশ্য যে বাহ্য জগতের অত্যদ্ভুত সমুদায় দৃশ্যকেই পরাভূত করিল!!

পিতা হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গান্তে দেখেন, পুত্র করযোড়ে তাঁহার প্রতি দৃষ্টি নিহিত করিয়া উপহার-হস্তে দণ্ডায়মান আছে। তাহার বিনয়নম্র দেহ ঘর্ম্মে আপ্লুত। দেখিবামাত্র পিতা শয্যা হইতে লম্ফ দিয়া উঠিলেন। পুত্র চরণে পড়িয়া পিতৃপাদপদ্ম বন্দনা করিলেন এবং "রিক্তপাণির্ন পশ্যেৎ তু রাজানং দেবতাং গুরুম্" [খালি হাতে রাজা দেবতা ও গুরুকে দর্শন করিবে না] এই মহাবাক্য সার্থক করিয়া, উপায়ন-দ্রব্য পরমারাধ্য দেবতা ও পরমগুরু পিতার চরণপ্রান্তে রাখিলেন। পিতা পুত্রকে বুকে টানিয়া লইলেন, তাঁহার নয়ন হইতে গজমুক্তা বিনতদেহ পুত্রের পৃষ্ঠে অবিরত ঝরিতে লাগিল। সমুপাগত আত্মীয়গণ এই স্বর্গীয় দৃশ্য আনন্দবিস্ফারিত নির্নিমেষ লোচনে দেখিতে লাগিল। তাহারা পরস্পর বলিতে লাগিল, "বহু পুণ্য না থাকিলে এরূপ স্বর্গীয় দৃশ্য নয়নগোচর হয় না।"

বঙ্গদেশে এইরূপ দৃশ্য অগণ্য। সেই জন্যই মনে হয়, বাঙ্গালা দেশ পৃথিবীর মধ্যে স্বর্গীয় দেশ। স্বর্গীয় দৃশ্য এখানে যত, এমন অন্যত্র দেখা যায় না। ইহার অন্তর্জগতের এক একটা দৃশ্য দেখিয়া পৃথিবীর অন্য সমস্ত অধিবাসীদিগকে স্তম্ভিত হইয়া থাকিতে হয়। বঙ্গভূমি পৃথিবীর মধ্যে যে কেবল সুজলা সুফলা তাহা নহে, অন্তর্জগতের দৃশ্যেও ইহা অতীব মনোমোহনকরী।

দৃশ্য—চতুর্দ্দশ।

বাল্যকালের কয়েকটী চিত্র।

১। নিকৃষ্টের নিকট উপদেশ লাভ।—বাল্যকালের একটী দৃশ্য হৃদয়পটে এমন ভাবে চিত্রিত হইয়া আছে যে, এই ষষ্টি বৎসরেও তাহা অপসারিত হইল না। আমরা কয়েকটী সহাধ্যায়ী ক্রীড়া করিবার জন্য আমাদের হরিনাভি গ্রামের পার্শ্ববর্ত্তী এক বিস্তৃত প্রান্তরে গমন করিয়াছিলাম। সেই নির্ব্বৃক্ষ প্রান্তরের মধ্যে একটী বিশাল বটবৃক্ষ ছিল এবং তাহার সন্নিকটে একটী সুন্দর সরোবর ছিল। পূর্ব্বকালে কোনও বাঙ্গালী মহাত্মা ধনী, মাঠে যে সকল গরু বাছুর চরিতে যায়, তাহারা আতপক্লিষ্ট হইলে এই বটবৃক্ষের ছায়ায় বিশ্রাম করিবে ও পিপাসিত হইলে এই সরোবরের সুমধুর জল পান করিবে, এই আশায় এই কীর্ত্তিদ্বয় স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তিনি কোন্ স্বর্গীয় বংশকে আত্মজন্ম দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন, তাহা কেহ বলিতে পারে না। এই কীর্ত্তিদ্বয় যে কেবল গরু বাছুরেরই তৃপ্তি বিধান করে, তাহা নহে, বহু আতপক্লিষ্ট ও পিপাসিত পথিকেরও আতপ-নিবারণ ও পিপাসা-শান্তি করে।

আমরা পুষ্করিণীর ধারে বটবৃক্ষের তলে ক্রীড়ায় মত্ত ছিলাম। কেহ বটবৃক্ষের ডালে উঠিতেছে, কেহ তাহাতে বসিয়া দোল খাইতেছে, কেহ বটের পাতা ছিঁড়িয়া তাহাতে মুকুট প্রস্তুত করিয়া মাথায় পরিতেছে, কেহ বটের ক্ষীর (আটা) কেমন শাদা দেখিবার জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডাল ভাঙ্গিতেছে। এইরূপ যখন

সকলেই উদ্দাম ক্রীড়ায় আসক্ত ছিলাম, তখন দেখা গেল, দুইটী নীচবংশীয় ছিন্নকৌপীনধারী বালক পাঁচনবাড়ি হাতে করিয়া স্কন্ধদেশে পরস্পর হস্ত সংলগ্ন করিয়া এক প্রান্তে দাঁড়াইয়া আছে। তাহারা জাতিতে কাওরা, সুতরাং ক্রীড়াসক্ত ব্রাহ্মণ বালকদিগের একেবারেই অস্পৃশ্য হওয়াতে তাহারা এক প্রান্তেই দাঁড়াইয়া আছে। তাহাদের কটাক্ষ ও মৃদু হাস্য আমাদের বিদ্রূপসূচক বলিয়া মনে হওয়াতে জিজ্ঞাসা করা হইল, "হাঁরে, তোরা আমাদের দেখিয়া যে হাসিতেছিস্ ?"

স্বল্পবয়স্ক বালকদ্বয় বলিল, "আপনারা না বামনের ছেলে ? আমরা ত আপনাদিগকে দেবতা বলিয়াই জানি। কিন্তু দেবতাদের কি এই কাজ! যে গাছটী রৌদ্রে পিঠ পাতিয়া দিয়া আপনাদিগকে ছায়া দিতেছে, আপনারা তাহারই পাতা ছিঁড়িতেছেন, তাহারই ডাল ভাঙ্গিতেছেন ? যে আশ্রয় দেয়, তাহার কি অনিষ্ট করিতে আছে ?"

কাওরা বালকদের মুখে এই কথা শুনিয়া আমাদের উদ্দাম ক্রীড়ার অবসান হইয়া গেল। আমরা স্বল্পবয়স্ক হইলেও সকলেই স্তম্ভিত। সহাধ্যায়ী বামাচরণ বিস্ময়ে বিহ্বল হইয়া বলিল, "ও ভাই! এরা কি সুন্দর কথাই বলিল! ইহাদিগকে আমরা অস্পৃশ্য বলিয়া ঘৃণা করি, কিন্তু ইহারা আজ আমাদের গুরু হইল"। যখন আমরা সেই হাসিমাখা কালকোল ছেলেদুটীকে নয়ন ভরিয়া দেখিতেছিলাম, তখন আর তাহাদিগকে নীচজাতীয় বলিয়া জ্ঞান হইল না। কেবল মনে হইতে লাগিল, কৃষ্ণ-বলরাম গোচারণার্থ পাঁচনবাড়ি হাতে দাঁড়াইয়া আছে। এই ষষ্টি বৎসর-

কাল যখনই এই চিত্র ভাবি, তখনই ইহা কৃষ্ণ-বলরামের চিত্র ভিন্ন অন্য চিত্র মনে হয় না। আহা, কি সুদৃশ্য!!

২। নগণ্য-প্রাণিরক্ষা।—বাল্যকালের আরও দুইটী চিত্র অঙ্কিত আছে। এক দিন কয়েকটী নৃশংস বালক, বিড়াল জলে ফেলিয়া দিয়া, কেমন সাঁতার দেয়, তাহা দেখিতেছিল। তাহাদের মধ্যে অন্যতম বালক বিড়ালের কষ্ট হইতেছে বুঝিতে পারিল ও বাল্যবন্ধুদিগকে অনুনয় বিনয় করিয়া বলিতে লাগিল, "ভাই সকল, বিড়ালটা এবার সাঁতার কাটিয়া পাড়ে উঠিলেই আর জলে ফেলিয়া দিওনা, দেখ উহা জল খাইয়া আর সাঁতার দিতে পারিতেছে না, ক্রমে অবশ হইয়া পড়িতেছে"। কিন্তু তাহার কথা ভাসিয়া গেল। বাল্যবন্ধুগণ আবার জলে ফেলিবার জন্য বিড়ালটীকে ধরিতে যাইতেছে; এমন সময় ঐ করুণার্দ্র-হৃদয় বালকটী উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া ফেলিল। বাল্যবন্ধুগণ উহাকে বড়ই ভাল বাসিত, সুতরাং উহাকে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে দেখিয়া অবাক্ হইয়া বলিতে লাগিল, আরে একটা বেরালের জন্য কাঁদিয়া ফেলিলি? একি তোর নিজের বেরাল যে, কান্না আসিল? বেরালের জন্য তোর যদি এতই কষ্ট হয়, তবে আমরা চলিলাম। এই বলিয়া বিদ্রূপ-হাস্য হাসিতে হাসিতে তাহারা অন্তর্হিত হইল। এক্ষণে অবসন্নপ্রায় বিড়ালকে নির্ব্বিপদ্ দেখিয়া ঐ বালকটী তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া লইল এবং গায়ের জল মুছাইয়া দিতে লাগিল, এবং "আমি অনন্যগতিক হইয়া কেবল এক ক্রন্দনের বলেই বিড়ালটীকে রক্ষা করিতে পারিলাম" এই চিন্তায় যখন তাহার শোকাশ্রুপূর্ণ গণ্ডদ্বয়ে আনন্দাশ্রু বহিতে লাগিল,

বিড়ালটী বুকে করিয়া তাহার গায়ে হাত বুলাইতে লাগিল, তখন তাহার বদনে যে সৌন্দর্য্যের বিকাশ হইল, তাহা আজিও চিত্তপটে অঙ্কিত রহিয়াছে।

৩। নগণ্য-প্রাণিরক্ষার দ্বিতীয় চিত্র।— কলিকাতায় বৌবাজারে হাইকোর্টের সুবিখ্যাত উকিল বাবু শ্রীনাথ দাসের বাটীতে মহাসমারোহে ৺দুর্গাপূজা হইত। আমার সহাধ্যায়ী তাঁহার দুই পুত্র জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস সুরেন্দ্রনাথ দাস আমাদিগকে পূজা উপলক্ষে নিমন্ত্রণ করিত। প্রসিদ্ধ নবীন গুঁই প্রভৃতির যাত্রা হইত। আমরা সকলে রাত্রি জাগিয়া আনন্দের সহিত তাহা শুনিতাম। নবমী পূজার দিন বিস্তর ছাগ বলি হইত। ঐ সময়েই আবার নৃত্যের প্রথা ছিল। যাহারা নৃত্য করিত, তাহাদের মাথায় হলুদগোলা জল ঢালিয়া দেওয়া হইত, তাহারা সিক্ত-বসনে নৃত্য করিত, বলিদানান্তে ছাগ-রক্ত মাখিত, একটা বীভৎস ব্যাপার ঘটিত।

বলিদানের সময়ে বাদ্য বাজিতে লাগিল, ঢাক, ঢোল, জগঝম্প, কাড়া, সানাই বাজিতে লাগিল। ছাগদিগকে স্নান করাইয়া সিন্দূর কপালে দিয়া সারি গাঁথিয়া হাড়কাটের নিকট দাঁড় করান হইল। কামার শাণিত খড়গ-হস্তে বলিদানার্থ জানু পাড়িয়া বসিয়া আছে, সমস্ত লোক গলে বস্ত্র দিয়া 'মা' 'মা' স্বরে গগন ফাটাইতেছে। একটী ছাগ বলি হইল। তাহার রক্তে ঐ স্থানটা ভাসিয়া গেল। বাজনা থামিল, আবার একটা ছাগ বলি হইবার জন্য সকলে আগ্রহে গল-বস্ত্রে প্রতীক্ষা করিতে-

৺ শ্রীনাথ দাস।

লাগিল। কতকগুলি বালক এই ভীষণ চিত্রে বিহ্বল হইয়া লুকাইল, কেহ কেহ বা চক্ষে দুই হাত চাপা দিল। অধিকাংশ শিশুদের এ চিত্র ভাল লাগিল না। বিশেষতঃ তাহারা যখন প্রত্যক্ষ করিল যে, অপর ছাগগুলি নিরাশ ও কাতরভাবে কাঁপিতেছে, তখন তাহারা সে দৃশ্য আর দেখিতে পারিল না। তাহারা কাঁদিয়া ফেলিল। বাবু শ্রীনাথ দাস করযোড়ে গলবস্ত্রে দাঁড়াইয়া বলি দেখিতেছিলেন। কম্পমান ছাগগুলির প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পতিত হওয়াতে তিনি আর থাকিতে পারিলেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ অশ্রুনয়নে কামারকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ভাই, আর বলিদান করিতে হইবে না। ছাগগুলিকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া আমার খড়গীর বাটীতে গিয়া রাখিয়া দেও। আমি উহাদিগকে পুষিব, উহাদের গায়ে অস্ত্রাঘাত হইলে ঠিক যেন নিজের গায়ে অস্ত্রাঘাত হইবে, এইরূপ মনে হইতেছে।" বলির আগে যে বাদ্য বাজনা থামিয়াছিল, তাহা একেবারেই থামিয়া গেল। যাহারা বলির পক্ষপাতী তাহাদের মধ্যে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। পুরোহিত ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন, "বাবু, করেন কি? উৎসর্গীকৃত ছাগের বলিদান না হইলে যে প্রত্যবায় হইবে? আপনি কি শেষে মা দুর্গার মন্যুতে পড়িবেন? অমন কাজ কদাচ করিবেন না!" কিন্তু তাঁহার এই ভয়প্রদর্শক উপদেশ কে শুনিবে? শ্রীনাথ বাবু তখন করুণাপ্রস্তাবে আর এক ধাতুর মনুষ্য হইয়াছেন। তাঁহার চিত্তে দেবভাব আবির্ভূত হওয়াতে এ সকল বিভীষিকা স্থান পাইল না। তিনি বলিতে লাগিলেন, "যিনি ছাগ সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি ছাগের

প্রাণরক্ষককে প্রীতিচক্ষেই দেখিবেন। তিনি তাঁহার জীবের প্রাণরক্ষার্থ যত ব্যস্ত, বিনাশের জন্য তত নহেন।"

ছাগ-বলি চিরদিনের জন্য বন্ধ হইয়া গেল। কুমড়া, ইক্ষু, শশা বলি হইতে লাগিল। যে সকল বালক বলির ভয়ে এতক্ষণ লুকাইয়া ছিল, তাহারা এই সংবাদ পাইয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। শ্রীনাথবাবু নির্নিমেষ লোচনে তাহাদের আনন্দমাখা মুখগুলি দেখিয়া ভাবে গদ্‌গদ হইতে লাগিলেন। ভীষণ চিত্রের পরিবর্ত্তে এক স্বর্গীয় চিত্র দেখা দিল। অধিকাংশ দর্শকেই এক নূতন ভাবে ভাবুক হইয়া নূতন মূর্ত্তি ধারণ করিল।

৪। **শত্রুর বিপদে বিপদ্ জ্ঞান।**—বাল্যের আর একটী চিত্র স্মরণ হইতেছে। শৈশবকালে আমাদের দুই জ্ঞাতির মধ্যে বিষম বিরোধ উপস্থিত হয়। উভয়ের মধ্যে যিনি আমাদের নিকট জ্ঞাতি, তাঁহার পক্ষেই আমাদিগকে থাকিতে হইয়াছিল। যাঁহার সহিত ইঁহার বিরোধ, তিনি আমাদিগকে তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিতে অনুরোধ করেন, কিন্তু নিকট জ্ঞাতিকে ছাড়া অসম্ভব বলাতে তিনি আমাদের প্রতি জাতক্রোধ হইলেন ও আমাদের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। শেষে অত্যাচারের পরিমাণ এরূপ বৃদ্ধি পাইল যে, গ্রাম ছাড়িয়া অন্য গ্রামে আমাদের এক আত্মীয়ভবনে আশ্রয় লইতে হইল। নিজের আশ্রয় সত্ত্বে পরগৃহে বাস অশেষ সঙ্কোচজনক হইলেও, অনন্যগতিক হইয়া সেই কষ্ট স্বীকার করিতে বাধ্য হইতে হইল।

এক মাস চলিয়া গেল, একদিন একটী লোক আসিয়া সংবাদ দিল, "যে ব্যক্তির অত্যাচারে তোমরা বাসত্যাগী হইয়াছ,

তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বিসূচিকা রোগে মারা পড়িয়াছে। এই বাক্যে আমার মা এত শোকাতুর হইলেন, যে তিনি করুণস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। আমি মায়ের এই বিচিত্র ব্যাপারে বিস্ময়াপন্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, হ্যাঁ মা, যে আমাদের সর্ব্বনাশ করিতে প্রস্তুত, তাহার সর্ব্বনাশে আনন্দ হইবার কথা, কিন্তু তুমি পুত্র-বিয়োগে যে শোক হয় সেইরূপ শোক করিতেছ কেন ?

মা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন বাবা, অমন কথা কদাচ মুখে আনিও না। যে সব ছেলে দুষ্ট, তাহারা মাকে কত গালি দেয় কত প্রহার করে, তাই বলিয়া কি মা কখন তাহার অমঙ্গল কামনা করেন ? যে জ্ঞাতি তোমাদিগকে এত কষ্ট দিয়াছেন, ভাবিয়া লও, তিনি তোমাদের বংশের দুষ্ট ছেলে। তিনি যতই আমাদের কষ্ট দিন না, তাঁহার কি অমঙ্গল কামনা করিতে আছে ? দুদিন পরে এই বিবাদ মিটিতে পারে, আবার গলাগলি ভাব হইতে পারে, তখন এই মৃত পুত্রের জন্য কি মনে দুঃখ আসিবে না ? বিশেষতঃ এই ছেলেটী বংশের তিলক ছিল, তাহাকে হারাইয়া মা বাপ কিরূপে বাঁচিবেন ? আজ যে তাঁহার পুরী শূন্য হইল ! সংসারের সমস্ত আশা ভরসা চলিয়া গেল ! এখন উঁহারা কি লইয়া থাকিবেন ? সংসার যে মরুভূমি হইয়া যন্ত্রণার স্থান হইয়া দাঁড়াইল ! বাবা, তুমিও আমার সহিত কাঁদ। ছেলেটী তোমাদের বংশের একটী উজ্জ্বল তারা ছিল। তাহার ঔজ্জ্বল্যে ঐ জ্ঞাতির বাড়ীর ন্যায় আমাদেরও বাড়ী আলোকময় হইতেছিল। আজ সেই তারা খসিল, সমস্ত বাটী তিমিরাচ্ছন্ন

হইয়া একেবারে শ্রীহীন হইয়া গেল !! হা ভগবন্, তুমি এত বড় শাস্তি কেন দিলে ? এই বলিয়া মাতা অশ্রুর প্রবল ধারায় ভাসিতে ভাসিতে হা হুতাস করিতে লাগিলেন।

তখন আমার বয়ঃক্রম সাত বৎসর হইবে। সেই দিন মায়ের মুখে যে স্বর্গীয় চিত্র দেখিয়াছি, তাহা আজিও ভুলিতে পারিতেছি না। যখনই সেই চিত্র চিন্তা করি, হৃদয়ে ভক্তির স্রোতঃ প্রবল বেগে বহিতে থাকে। মনে হইতে থাকে, ধন্য আমি, যে এমন স্বর্গীয় দেবীর গর্ভে স্থান পাইয়াছি !

দৃশ্য—পঞ্চদশ ।

[প্রভুর প্রতি অনুরাগ।]

চব্বিশ পরগণায় এক গণ্ডগ্রামে গোরাচাঁদ চক্রবর্ত্তী নামক এক কুলীন সুব্রাহ্মণ কলিকাতায় এক ইংরাজ মহোদয়ের অধীনে কাজ করিতেন। তাঁহার ধর্ম্মনিষ্ঠতা ও সকল বিষয়েই পটুতা দেখিয়া উক্ত ইংরাজ তাঁহাকে বড়ই ভাল বাসিতেন। ক্রমে ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারীর গুণে তিনি এত আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন যে, তাঁহার প্রতি উঁহার সাংসারিক ভার ও পড়িতে লাগিল। ইংরাজ ও উক্ত কর্ম্মচারীর মধ্যে শেষে পিতা পুত্রের সম্বন্ধ দাঁড়াইল। টাকা কড়ি সমস্তই ব্রাহ্মণের হাতে। ইংরাজ মহোদয়ের কেহ না থাকাতে কর্ম্মচারীই তাঁহার ভাই বল, বন্ধু বল, সকলেরই স্থান অধিকার করিলেন। ব্রাহ্মণের গুণেই তাঁহার কাজে যথেষ্ট লাভ হইতে লাগিল।

ইংরাজ মহোদয়ের বয়স হইয়াছিল। তাঁহার ইচ্ছা হইল, যে কয়টা দিন বাঁচিব, দেশে গিয়াই কাটাইব। তদনুসারে তিনি ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারীর সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন। ইংরাজ মহোদয় স্বর্গাদপি গরীয়সী মাতৃভূমি দর্শনার্থ লালায়িত হইয়াছেন ভাবিয়া, ঐ কর্ম্মচারী তাহাতে বাধা দিতে ইচ্ছা করিলেন না, কিন্তু পুত্র যেরূপ পিতৃহারা হইয়া আকুল হয়, সেইরূপ হইলেন। তিনি সর্ব্বদাই বিষণ্ণ থাকিতেন, কিন্তু ইংরাজ-মহোদয়, পাছে তাঁহার ব্যাকুলতা জানিয়া চিন্তিত হন্, সেই ভয়ে তাঁহার নিকট গোপন করিতেন।

ইংরাজ মহোদয় বিলাতে যাইবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। কর্ম্মচারীও যাহাতে পথে তাঁহার কোনও অভাব-জনিত ক্লেশ না হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন।

একদিন ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারী ইংরাজকে বলিলেন, দেখুন পিতঃ, আপনার নিজ নামে যে মুদ্রা ব্যাঙ্কে জমা আছে, সেই টাকাটা বিলাতে যাইবার অগ্রে সেই স্থানের একটা ব্যাঙ্কে জমা দিন। প্রভু মাথা নাড়িয়া বলিলেন, না ধন, আমি বিলাতে পৌঁছিয়া তোমাকে পত্র লিখিলে, তুমি আমার দরকার মত টাকা ব্যাঙ্ক্ হইতে তুলিয়া আমার নিকট পাঠাইয়া দিও। বোধ হয় তাঁহার মনে মনে ইচ্ছা ছিল, যদি জীবনাবশেষে কিছু টাকা রহিয়া যায় তাহা ব্রাহ্মণেরই ভোগে আসিতে পারিবে। তিনি ব্রাহ্মণকে ব্যাঙ্ক হইতে টাকা তুলিয়া লইবার ক্ষমতা লিখিয়া দিলেন।

বিলাতে যাইবার দিন ক্রমে সন্নিকট হইতে লাগিল। ইংরাজ ও ব্রাহ্মণ যুবক উভয়েই পরস্পরের বিরহ কিরূপে সহ্য করিবেন.

ভাবিয়া আকুল হইতে লাগিলেন। শেষে যাইবার দিন উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মণকর্ম্মচারী সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য সঙ্গে লইয়া ইংরাজকে জাহাজে তুলিয়া দিতে চলিলেন। চক্ষের জল চাপিয়া রাখিবার চেষ্টা করিলেও তাহা ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। গোপনে কতক্ষণ অশ্রু মুছিবেন? ইংরাজ মহোদয় দেখিয়া ফেলিলেন এবং আশ্বাসবাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার নিজের প্রাণ যে ফাটিয়া যাইতেছে তজ্জন্য আশ্বাস কে দিবে? শেষে দুইজনেই নির্ব্বাক্ ও গলদশ্রু।

দুই জনেই জাহাজে উঠিলেন। সমুদ্র-পথে পরিচর্য্যার্থ জাহাজে যে ভৃত্য নির্দ্দিষ্ট ছিল, ব্রাহ্মণ তাহাকে, কোথায় কোন্ প্রয়োজনীয় দ্রব্য আছে, তাহা বুঝাইয়া দিলেন। জাহাজ ছাড়িবার সময় সন্নিকট হইল। ইংরাজ মহোদয় ব্রাহ্মণ যুবককে বিদায় দিবার সময় আলিঙ্গনার্থ দুই হস্ত প্রসারিত করিলেন, তিনিও ব্যাকুল ভাবে উঁহার বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। কেহই কাহাকেও ছাড়িতেছেন না। দুই জনেরই গণ্ডদ্বয় জলধারায় ভাসিতে লাগিল। জাহাজের লোকেরা অবাক্ হইয়া বলিতে লাগিল, এ যে পিতা-পুত্রের আলিঙ্গন, এরূপ আলিঙ্গন শাদা কালোর মধ্যে ত কখনই দেখা যায় না! দর্শকগণ একেবারেই নির্ব্বাক্। তাহাদের দৃষ্টি বিস্ময়ে বিস্ফারিত ও নিমেষহীন হইল। তাহারা এই অদ্ভুত চিত্র যতই দেখে ততই তাহাদের দর্শনস্পৃহা বলবতী হইতে লাগিল।

জাহাজ ছাড়িবার ঘণ্টা বাজিল। সাহেব প্রিয়তম কর্ম্মচারীকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন। ব্রাহ্মণ বিদায় লইয়া

নদীর তীরে গিয়া দাঁড়াইলেন। একজন জাহাজে দাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিলেন, অপর জন তীরে দাঁড়াইয়া অশ্রুতে ভাসিতে লাগিলেন। যিনিই উঁহাদের এই দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন, তিনিই বলিতে লাগিলেন, "এমন না হইলে কি প্রভু! এমন না হইলে কি ভৃত্য! বাঃ, কি সুন্দর দৃশ্য!!"

জাহাজ ছাড়িল, উভয়েই নির্নিমেষ সাশ্রুলোচনে পরস্পরকে দেখিতে লাগিলেন। ক্রমে উভয়েই দৃষ্টির বহির্ভূত হইলেন। ইংরাজের কি অবস্থা হইল, তাহা কে বলিয়া দিবে? কিন্তু উক্ত ব্রাহ্মণ এত আকুল হইলেন যে, সমীপস্থ ব্যক্তিমাত্রেরই চক্ষু জলে ভরিয়া গেল।

গবর্ণমেণ্টের এডুকেশন সেক্রেটারী স্যার্ আল্‌ফ্রেড্ ক্রফ্‌ট্ যখন শেষবারে বিলাত যাত্রা করেন, তখন তাঁহার ও তাঁহার এক মুসলমান ভৃত্যের মধ্যে এই চিত্র দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। ভৃত্য ত কাঁদিবেই, কিন্তু ক্রফ্‌ট্ ভৃত্যের জন্য যেরূপ আকুলভাবে কাঁদিয়াছিলেন, তাহা যে জনই দেখিয়াছিল, সেই অবাক্ হইয়া ভাবিয়াছিল, শাদা কি কালোর জন্য এত আকুল হয়? ক্রফ্‌ট্ ভৃত্যকে পুরস্কার দিবার জন্য একখানি চেকে প্রথমে ১ লিখিয়া তাহাতে দুইটা শূন্য দিলেন, আবার শূন্য দিলেন। আবার আর একটা শূন্য দিতে যাইতেছেন, তাঁহার এক বন্ধু হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, "কর কি? হাজার হইয়া গিয়াছে। এবার শূন্য দিলে যে দশ হাজার হইয়া যাইবে? সব টাকাই যদি ভৃত্যকে দিয়া যাও, তবে নিজে কি লইয়া ঘরে ফিরিবে?" ক্রফ্‌ট্ কাঁদিয়া বলিলেন, "ভাই, ইহাকে আমি সর্ব্বস্ব দিলেও আমার কষ্ট হইবে

না। এ আমার প্রাণ বাঁচাইয়া রাখিয়াছিল। দশ হাজার টাকাতেও ইহার প্রত্যুপকার সম্ভবে না। তোমরা বাঙালীকে ঘৃণা করিতে পার, কিন্তু আমি তাহাদের এত গুণ দেখিয়াছি যে, মুগ্ধ হইয়া গিয়াছি!"

ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারী সাহেবকে বিদায় দিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে ঘরে ফিরিলেন। আহার নিদ্রা কিছুই ভাল লাগিল না। কেবল দিবানিশি প্রভুমূর্ত্তি মনে চিত্রিত হইতে লাগিল।

এক মাস কাটিয়া গেল। ব্রাহ্মণ ভাবিতে লাগিলেন, "প্রভু এত দিনে দেশে উপস্থিত হইয়াছেন। হয়ত কল্য পত্র পাইব।" কিন্তু দিনের পর দিন চলিয়া যাইতে লাগিল, পত্রের দেখা নাই।

ব্রাহ্মণ চিন্তা করিতে লাগিলেন "এ কি সর্ব্বনাশ! প্রভুর কোনও সংবাদ নাই কেন? তাঁহার সমস্ত টাকা যে আমার হাতে! আমি এ টাকা লইয়া কি করিব? ভগবন্! এ কি বিপদে ফেলিলে! একে ত তাঁহার শোকে জর্জ্জরিত হইতেছি, তাহাতে আবার এ কি দুর্ভাবনায় ফেলিলে?"

ক্রমে এক বৎসর দুই বৎসর পাঁচ বৎসর কাটিয়া গেল। ইংরাজমহোদয়ের কোনও সংবাদ নাই। "তিনি নিশ্চয়ই জাহাজে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, অন্যথা, বিলাতে পৌঁছিয়াই, তারযোগে পৌঁছিবার সংবাদ দিতেন। নিশ্চয়ই এই হতভাগার বিরহ-শোক অসহ্য হওয়াতে পীড়িত হইয়া, সেই পীড়ায় মহাত্মা প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছেন।" এইরূপ চিন্তায় ব্রাহ্মণের শোকাবেগ প্রবল হইলেও তিনি টাকার ভাবনায় অত্যন্ত আকুল হইয়া পড়িলেন।

ইংরাজের দূরসম্পর্কীয় কোন লোকের সন্ধান পাইলেও টাকাটার একটা গতি করিতে পারি, এই ভাবিয়া, তাহার সন্ধান লইতে লাগিলেন। কিন্তু সে সন্ধান কোথায় পাইবেন ?

দশ বৎসর কাটিয়া গেল, দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় স্বজনের কোনও সংবাদ পাইলেন না। শেষে ব্রাহ্মণ স্থির করিলেন, উক্ত মহাত্মার স্বর্গার্থ আমাদের হিন্দু-প্রথা অবলম্বন করা যাউক। তাঁহার টাকায় যাহাতে বহু লোকের তৃপ্তি হয়, তাহাই করা যাউক। লোকের তৃপ্তি হইলে তাঁহারও তৃপ্তি হইবে, তাঁহার অক্ষয় স্বর্গ হইবে।

ব্রাহ্মণ মনে মনে এই স্থির করিয়া, কি উপায়ে লোকের পরম তৃপ্তিলাভ হয় তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। নিরন্নদিগকে অন্নদান করিতে পারিলে তাহাদের পরম তৃপ্তি হয়। অতএব নিরন্নদিগকে অন্নদান করা যাউক। এই ভাবিয়া তিনি যেখানে নিরন্ন দেখিতেন সেইখানেই অন্ন যোগাইবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন।

এক দিন ভাবিলেন, কাঙালেরা কখনও লুচি মিঠাই খাইতে পায় না। যাঁহারা বড় বড় শ্রাদ্ধাদিতে কাঙালী ভোজন করান, তাঁহারা চিঁড়া মুড়কী দধি পর্য্যন্ত উঠেন, কিন্তু লুচি মিঠাই তাহাদিগকে দেন না। লুচি মিঠাই খাইলে ইহাদের যে তৃপ্তি হইবে, তাহা অচিন্তনীয়। ইহাতে স্বর্গত মহাত্মার পরম তৃপ্তি হইবে।

যেমন চিন্তা অমনি কাজ। তিনি স্থানীয় সমস্ত কাঙালী নিমন্ত্রণ করিলেন। তাহারা যখন লুচি মিঠাই খাইয়া অভাবনীয় আনন্দের সহিত পরম তৃপ্তি লাভ করিতে লাগিল, তখন ব্রাহ্মণ মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "আজ আমার প্রভু স্বর্গে বসিয়া

এতগুলি লোকের পরম তৃপ্তি প্রত্যক্ষ করিয়া আমার দিকে স্মিত-মধুর দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন। আমার জীবন আজ ধন্য হইল!”

তিনি কাঙ্গালদিগের সারির মধ্যে বিচরণ করিতে করিতে প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, “বাপ সকল, তোমরা জড়ান জড়ান গোল গোল, যাহাকে জিলিপি বলে, তাহা পাইয়াছ? লাল রঙের গোল গোল জিনিস, যাহাকে পান্তুয়া বলে, তাহা পাইয়াছ? শাদা শাদা চিনি মাখান চক্রাকার দ্রব্য, যাহাকে খাজা বলে, তাহা পাইয়াছ?” তাহারা আনন্দ-বিস্ফারিত নেত্রে অশেষ তৃপ্তি প্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিল, “বাবা, আমরা সমস্তই পাইয়াছি। আপনার পরিবেষণকর্ত্তারাও সব ভাল লোক। আমাদের যে জিনিষটা ভাল লাগিয়াছে, পরিবেষ্টারা অকাতরে তাহা দিয়াছে! আমরা কি এসব জিনিস কখন চক্ষে দেখিয়াছি, যে, নাম বলিতে পারিব? আমরা সব পাইয়াছি।”

কাঙালদিগের এইরূপ তৃপ্তি-প্রকাশক বাক্যে ব্রাহ্মণের হৃদয় আনন্দে ডুবিয়া গেল। তিনি স্বর্গস্থ ইংরাজ প্রভুকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন, “পিতঃ! হিন্দুমতানুসারে তোমার তৃপ্তি বিধান করিতেছি। তুমি স্বর্গ হইতে এই সুচিত্র দর্শন কর। আশীর্ব্বাদ কর, যেন একটী পয়সা আমার বা আমার ছেলেদের ভোগে খরচ না করি। যাহাতে কাঙালদিগের তৃপ্তি বিধান করিয়া তোমার স্বর্গবাস অক্ষয় করিতে পারি, সেই সুমতি দান কর।”

দ্বিজরাজ! তুমি বাঙালীদিগের আসন কি উচ্চ করিয়া দিলে! যখনই তোমার প্রভুভক্তি স্মরণ হয়, তখনই মনে হয়, ভাগ্যে বাঙালীর ঘরে জন্মিয়াছিলাম, তাই আপনাকে এত

গৌরবান্বিত করিবার সুবিধা পাইলাম! তুমি সর্ব্বজাতির পূজ্য ব্রাহ্মণকে পূজ্যতম করিয়া তুলিলে !!

দৃশ্য—ষোড়শ।

লোকোপহাসে ঔদাসীন্য।

একদিন সংস্কৃত কলেজের একটী ছাত্র কলিকাতা হইতে হরিনাভিতে যাইবার জন্য সুসজ্জায় সজ্জিত হইয়া মাতলা-রেল-ওয়ের আশ্রয় লয় ও সোণারপুর ষ্টেশনে উপস্থিত হয়। তখন তাহার বয়ঃক্রম পঞ্চদশ বর্ষ হইবে। তৎকালে ডায়মণ্ড হারবার-রেলওয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, সুতরাং হরিনাভি যাইতে হইলে সকলে সোণারপুর ষ্টেশনেই নামিত। হরিনাভি সোণারপুর হইতে প্রায় তিন মাইল।

ছাত্রটী সোণারপুর হইতে পদব্রজে হরিনাভিতে যাইতেছে, হঠাৎ তাহার দৃষ্টি হরিনাভিনিবাসী একটি দরিদ্র বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের উপর পতিত হইল। বৃদ্ধ নিজের জীর্ণ পর্ণকুটীরের সংস্কারার্থ ভিক্ষা করিয়া সোণারপুরে একটী বাঁশ পাইয়াছিলেন; সেই বাঁশটী স্কন্ধে করিয়া চলিতেছেন। বংশের ভারে তিনি অবসন্ন হইয়া পড়িতেছেন। তাঁহার গা টলিতেছিল; সমস্ত দেহ ঘর্ম্মাক্ত হইয়া কাঁপিতেছিল।

ছাত্রটী একটু দ্রুত চলিয়া ব্রাহ্মণের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, "আপনি এত বড় একটা ভারি বাঁশ তিন মাইল পথ কেমন করিয়া লইয়া যাইবেন?"

বৃদ্ধ কাতরভাবে বলিলেন, "বাবা, আমি ত মরিতে বসিয়াছি। কিরূপে যে এতটা পথ এ বাঁশ ঘাড়ে করিয়া যাইতে পারিব, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। অথচ ইহা আমাকে লইয়া যাইতেই হইবে; কারণ, আমার ঘরের খুঁটি না বদলাইলে ঘরখানি সত্বরই পড়িয়া যাইবে, তখন কোথায় মাথা গুঁজিয়া থাকিব? এই ভাবনায়, অসহ্য ক্লেশ পাইয়াও ইহা লইয়া যাইতে হইতেছে।"

ছাত্রটী আগ্রহের সহিত বলিল, "আপনি বাঁশটি আমার স্কন্ধে চাপাইয়া দিন, আমি লইয়া যাইতেছি। আপনাকে যেরূপ ক্লান্ত দেখিতেছি, আপনার সর্দ্দিগর্ম্মি হইবার সম্ভাবনা।"

ছাত্রটী যেমনি এই প্রস্তাব করিল, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ক্ষণবিলম্ব না করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার ঘাড়ে বাঁশটী চাপাইয়া দিয়া, "আঃ, তুমি আমার প্রাণ বাঁচাইলে" বলিয়া, বহু আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন।

ছাত্রটী শুভ্র পরিচ্ছদে সুসজ্জিত ছিল। শাদা উড়ানীর দুই প্রান্তদেশ দুই স্কন্ধে যেন দুইটী শুভ্র পক্ষের ন্যায় শোভা পাইতে-ছিল। সেই শুভ্র উড়ানীর উপর এক প্রকাণ্ড বাঁশ। এই দৃশ্য দেখিয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের চমক হইল। তখন তিনি কাতর হইয়া বলিলেন, "বাবা, তোমার এই শাদা পরিচ্ছদের উপর এক প্রকাণ্ড বাঁশ দেখিয়া পথের সমস্ত লোক হাস্য সংবরণ করিতে পারিবে না। শেষে কি তোমাকে পাগল মনে করিয়া হাততালি দিবে? গায়ে ধূলা পাতা দিবে? তোমার এই চিত্র দেখিয়া আমিই হাস্য সংবরণ করিতে পারিতেছি না; পথিকেরা যে কি বলিবে, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। দেও বাবা, বাঁশটী পুনর্ব্বার আমার

ঘাড়ে চাপাইয়া দেও। আমি দুই দশ পা গিয়া বিশ্রাম করিব, আবার ঘাড়ে করিব। এইরূপে সমস্ত দিনেও কি বাঁশ লইয়া বাড়ী পৌঁছিতে পারিব না?"

ছাত্রটী বলিল, "আপনি দেখিতেছেন বেলা কত হইয়াছে? রৌদ্রের তেজঃ কেমন বাড়িয়াছে? আপনি স্নান আহ্নিক পূজা কখন করিবেন? কখনই বা আহার করিবেন? লোকে যদি একান্তই ধূলা পাতা গায়ে দেয়, নাচার! সেই ভয়ে আপনাকে বিপদে ফেলিতে পারিব না। আসুন, আপনি আমার সঙ্গে একটু চলিয়া আসুন, রৌদ্রের তেজঃ ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে।"

ব্রাহ্মণ, ছাত্রের দৃঢ়তা দেখিয়া গলদশ্রু হইয়া বলিতে লাগিলেন, "বাবা, তুমি দীর্ঘায়ু লাভ কর। তোমার এই মিষ্ট বাক্যে আমার শরীর জুড়াইল। যদি কেহ তোমাকে পাগল বলিয়া ধূলা পাতা গায়ে দিতে আসে, আমি অমনি করযোড়ে তাহাকে বলিব, এ বাঁশটী ও বালকের নয়, এটী আমার; আমাকে বিপন্ন দেখিয়া ছেলেটী আমার প্রাণ রক্ষার জন্য এই সাজ সাজিয়াছে! যদি ধূলা পাতা গায়ে দিতে হয়, আমার গায়ে দেও।"

ছাত্রটী বাঁশ ঘাড়ে করিয়া চলিতে লাগিল। গ্রামের লোকেরা সকলে তাহাকে ভাল বাসিত। তাহারা উপহাস করিবে কি? নির্নিমেষ লোচনে এই দৃশ্য দেখিতে লাগিল। কেহ কেহ বলিতে লাগিল, "ওগো, আজ আমাদের অমুক কি এক চিত্র দেখাইতেছে, দেখ। পশ্চাৎ পশ্চাৎ যে কৃশ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আসিতেছেন, বোধ হয় বাঁশটী উঁহারই হইবে। ব্রাহ্মণকে ক্লিষ্ট দেখিয়া বোধ হয় ছেলেটী তাঁহার ভার নিজের স্কন্ধে চাপাইয়াছে। ছেলেটীকে

তোমরা আশীর্ব্বাদ কর, যেন চিরদিন এই মহাব্রতেই ব্রতী থাকিতে পারে। আহা কি সুদৃশ্যই দেখিতেছি!!”

দৃশ্য—সপ্তদশ।

মিত্রতা (প্রথম অংশ)।

ডাক্তার বিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায় কলিকাতায় মেডিকেল কলেজ হইতে এম, বি পরীক্ষায় বিশেষ সুখ্যাতির সহিত উত্তীর্ণ হইয়া, প্রথমে নাটুদাতে বিপ্রদাস পালচৌধুরীদিগের হাসপাতালে চিকিৎসকরূপে নিযুক্ত হন। ইনি হালিসহর-নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ জজ্ পণ্ডিত মধুসূদন বাচস্পতির পৌত্র, বাবু উমানাথ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র। উমানাথ বাবু একজন সুকবি ছিলেন। তাঁহার সময়ে পাঁচালি ও কবির লড়াই হইত, তিনি তাহাদের জন্য গান ও ছড়া বাঁধিয়া দিতেন। নাটুদাতে ডাক্তার বিপিনের চিকিৎসায় সুযশঃ হইতে লাগিল এবং দ্বিতীয় দুর্গাচরণ ডাক্তার বলিয়া খ্যাতি হইল।

বিপ্রদাস পালচৌধুরীর বাটীতে একটী বালক পীড়িত হইল। এলোপ্যাথি চিকিৎসায় তাহার বিশেষ ফলোদয় না হওয়াতে বিপিন পরামর্শ দিলেন, ‘একবার ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার দ্বারা হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করান হউক।’

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার্থ বালককে কলিকাতায় আনয়ন করা হইল। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল চিকিৎসা করিতে লাগিলেন, বিশেষ ফল হইল না। বিপিন, ডাক্তার সরকারকে চিকিৎসার পথ দেখাইয়া দিলেন, সেই পথে চিকিৎসা করাতে রোগী সত্বর

আরোগ্য লাভ করিল। ডাক্তার সরকার বিপিনের চিকিৎসা-বিষয়ে অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া হোমিওপ্যাথি ধরিতে অনুরোধ করিলেন ও স্বয়ং পড়াইতে আরম্ভ করিলেন।

এক দিন ডাক্তার সরকার বিপিনকে হোমিওপ্যাথি উপদেশ দিবার সময়ে বলিলেন, "দেখ বিপিন, হোমিওপ্যাথি ঔষধে কিছু উপকার বোধ হইলে আর তাহা পুনঃ প্রয়োগ করিতে নাই; অথচ রোগী ঔষধ খাইতে চাহিবে। সে ক্ষেত্রে কেবল জলে এক্ আধ ফোঁটা স্পিরিট্ দিয়া ঔষধের গন্ধ করিয়া রোগীকে খাইতে দিবে।" বিপিন বলিলেন, "মহাশয়, ওকাজ আমার দ্বারা হইবে না। আমি রোগীর সহিত প্রতারণা করিতে পারিব না।" ডাক্তার সরকার বিপিনের সত্যনিষ্ঠতা দেখিয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় অবস্থান করিয়াছিলেন। বিপিনের জীবনে সত্যনিষ্ঠতা এমন ফুটিয়া উঠিয়াছিল যে, তদ্দর্শনে লোকে বিমুগ্ধ হইয়া পড়িল, এবং বিপিন যখন বলিয়া গিয়াছেন এ রোগ সারিবে, তখন এ রোগীকে মারিতে যমেরও সাধ্য নাই" এইরূপ লোকের ধারণা হইতে লাগিল।

কলিকাতায় তাঁহার চিকিৎসার গুণে অনেকগুলি ভদ্রলোক তাঁহার বন্ধু হইলেন। রায় বাহাদুর বিপিন বিহারী গুপ্ত তাঁহার বাল্য-বন্ধু। জি, সি, বোস, স্যার্ পি, সি, রায়, এন, ঘোষ প্রভৃতির সহিত তাঁহার সৌহৃদ্য জন্মিল। বিশেষতঃ সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ, পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, শরচ্চন্দ্র সোম ও কলিকাতার অন্য কলেজের একজন সংস্কৃতাধ্যাপকের সহিত তিনি পরমাত্মীয়তা-সূত্রে আবদ্ধ হইতে লাগিলেন। এই কয় বন্ধুর বাটীতে চিকিৎসাকালে

তিনি কয়েকটী রোগীকে বহু চেষ্টা ও পরিশ্রমে যমের দ্বার হইতে ফিরাইয়া আনিতে পারিয়া ইঁহাদিগকে কৃতজ্ঞতাঋণে এরূপ আবদ্ধ করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা 'এ ঋণ জীবনে কখন শোধ হইতে পারে না', ভাবিয়া কেবলই তদ্গতচিত্ত হইয়া থাকিতেন। ইঁহারা বিপিনকে যে কি চক্ষেই দেখিতেন, তাহা অবর্ণনীয়।

যখন এই কয়টী বন্ধু একত্র মিলিত হইতেন, তাঁহাদের সরোজ-বিনিন্দিত মুখগুলি ফুটিয়া উঠিত, তখন মিত্রতা-চিত্র যে কি মধুর, কি মনোরম, কি স্বর্গীয় এবং বিপৎসঙ্কুল জ্বালাময় সংসারে কি শান্তিপ্রদ, তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না

বিধাতার ঘটনাচক্রে এ সুখদৃশ্য চিরস্থায়ি হইল না। বিপিনের একটী পুত্র ও ছোট ভাই নৌকা ডুবি হইয়া গঙ্গায় প্রাণ হারাইল। তাহাদের জন্য বিপিনের এত শোক হইল যে, তাঁহার মস্তিষ্কের রোগ জন্মিল। ডাক্তার নীলরতন সরকার তাঁহাকে দার্জ্জিলিঙ্ যাইতে পরামর্শ দিলেন। পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিপিনের শুশ্রূষার্থ আপন ভাগিনেয়কে সঙ্গে পাঠাইলেন। তাঁহার এক বন্ধুও কর্ম্ম হইতে কয়েক দিনের অবসর গ্রহণ করিয়া তাঁহার অনুগামী হইলেন। এই বন্ধু যখন বিপিনের অনুগমনার্থ কর্ম্মস্থান হইতে কয়েক দিনের জন্য অবসর প্রার্থনা করেন, তখন তাঁহার কর্ম্মস্থানের অধ্যক্ষ সারদারঞ্জন রায় বলিয়াছিলেন, "ডাক্তার বিপিন আপনার বহু উপকার করিয়াছেন; তাঁহার প্রত্যুপকারের জন্য আপনি যতদিন ছুটি চাহিবেন, তাহা আমি অকাতরে দিতে বাধ্য।' ইহাতে আমার কার্য্যের যথেষ্ট ক্ষতি হইবে, দেখিতেছি, কিন্তু নাচার!

প্রত্যুপকারদ্বারা বিপিনের ঋণ শুধিবার সম্ভাবনা নাই, তথাপি যতটুকু পারেন, এই আশায় রাজেন্দ্রনাথের প্রতিনিধি-স্বরূপ তাঁহার ভাগিনেয়, ও ঐ বন্ধু তাঁহাকে দার্জ্জিলিঙে লইয়া যাইলেন। বিপিন অত্যন্ত দুর্ব্বল ও চলচ্ছক্তিহীন। অথচ পথভ্রমণ তাঁহার ঔষধ। মিত্র নানা গল্পে, দার্জ্জিলিঙের নানা বিচিত্র চিত্রে তাঁহাকে অন্যমনস্ক করিয়া তাঁহার অজ্ঞাতসারে একটু একটু করিয়া পথ চলাইতে লাগিলেন। এই দৃশ্য কি সুন্দর! এক দিকে হিমালয় পর্ব্বতের অতুল্য দৃশ্য, আর এক দিকে মিত্রের আরোগ্যের জন্য বন্ধুর প্রয়াসদৃশ্য। এই দুই মনোরম দৃশ্যের মধ্যে মনোরমত্ব-বিষয়ে কোনটিই কম বলিয়া মনে হয় না। দেবভূমি হিমালয়ের দৃশ্যেও স্বর্গ, মিত্রের আয়াসচিত্রেও স্বর্গ। তখন যে দিকেই নয়ন নিক্ষেপ করা যায়, সমস্তই স্বর্গময়।

অল্পদিন মধ্যেই বিপিনের রোগের হ্রাস হইল দেখিয়া, উক্ত মিত্র রাজেন্দ্রনাথের ভাগিনেয়ের উপর সমস্ত সেবাভার অর্পণ করিয়া কর্ম্মস্থানে আসিবার জন্য আনন্দে বিপিনের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। বিপিনও মহাহর্ষে বিদায় দিয়া ষ্টেশন্ অবধি মিত্রের অনুসরণ করিলেন। গাড়ী ছাড়িবার সময় যখন উভয়ে সাশ্রুনয়নে পরস্পরের মুখে দৃষ্টি স্থির করিয়া রাখিলেন, তখন তাহার মধ্যে কি যে এক অপরূপ দৃশ্য লক্ষিত হইতে লাগিল, তাহা যে দেখে নাই তাহার বোধগম্য হইবার নহে। মিত্র ভাবিতে লাগিলেন, "বিপিনের রোগমুক্তির জন্য আমার এই সামান্য প্রয়াস আজ সার্থক হইল! বিপিনের ঋণ শুধিবার সামর্থ্য নাই, তাঁহার প্রত্যুপকারের জন্য এই যৎসামান্য প্রয়াস আমাকে আজ কৃতার্থ

করিল।" এই চিন্তার সহিত মিত্রের চক্ষু জলে ভরিয়া যাইতে লাগিল। বিপিনও "আহা! আমার মিত্র আমার রোগ স্যারাইবার জন্য অর্থের দিকে কষ্টের দিকে লক্ষ্য না করিয়া আমাকে রোগ-মুক্তির পথে দাঁড় করাইয়া গেল! এ ত মিত্র নয়, এ বোধ হয় পূর্ব্ব জন্মে আমার ভাই ছিল, তাহা না হইলে এত টান কি জন্য!" ইত্যাদি ভাবিতে ভাবিতে অশ্রুজলে ভাসিতে লাগিলেন।

গাড়ী ছাড়িল, অশ্রুভরা চারিটী চক্ষুঃ ক্রমে ক্রমে পরস্পর হইতে বিযুক্ত হইয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। কিন্তু দর্শকদিগের মনে এই স্বর্গীয় দৃশ্য চিরদিনের জন্য অঙ্কিত হইয়া রহিল।

দৃশ্য—সপ্তদশ।

মিত্রতা (দ্বিতীয় অংশ)।

দার্জ্জিলিঙে থাকিয়া ডাক্তার বিপিন আরোগ্য লাভ করিলেন ও কলিকাতায় আসিয়া আবার চিকিৎসাব্যবসায় করিতে লাগিলেন। কিন্তু পরিশেষে একটা প্রবল চিন্তা তাঁহার মানসকে আশ্রয় করিল। তিনি সর্ব্বদাই ভাবিতে লাগিলেন, 'যদি হঠাৎ মারা যাই, আমার নাবালক পুত্র ও স্ত্রীকে কে রক্ষা করিবে?' বিপিনের মিত্রগণ তাঁহার এই দুর্ভাবনা জানিতে পারিয়া, তাঁহাকে অনেক বুঝাইলেন, এবং 'তাহাদের ভার আমরা লইব' বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন, তথাপি তাঁহার ভাবনা ঘুচিল না। পতিব্রতা পত্নী স্বামীকে দুর্ভাবনায় দিন দিন কৃশ হইতে দেখিয়া, কিসে অশেষ গুণধর স্বামীর আগেই মরিতে পারি এই চিন্তায় দিন

কাটাইতে লাগিলেন। স্বামী চিকিৎসাব্যবসায় হইতে অবসর লইয়া হালিসহরে নিজের বাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। হালিসহর ম্যালেরিয়ার আকর। একতলা বাড়ীতে থাকিলে ম্যালেরিয়া ধরিবে, এই ভাবিয়া বাড়ীটা দ্বিতল করিলেন। কিন্তু বাড়ী দ্বিতল করিলেও ম্যালেরিয়া হইতে অব্যাহতি পাইলেন না। স্ত্রী, পুত্র ও নিজে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইলেন। জীবনের সঙ্গিনী নানাগুণে গুণবতী পত্নী জীবনলীলা সাঙ্গ করিলেন। বিপিনের বন্ধুগণ কলিকাতা হইতে হালিসহর গিয়া তাঁহাকে প্রবোধ দিয়া আসিতেন। ইঁহাদের মুখ দেখিয়া বিপিন অনেক ক্লেশ ভুলিয়া যাইতেন।

ক্রমে তাঁহার জীবনের প্রধান ভরসাস্বরূপ পিসীমা ও সদু নামে বহুদিনের একটী চাকরাণী পীড়ার প্রকোপে পড়িয়া প্রাণ হারাইলেন। বিপিন এক প্রকার নিরাশ্রয় হইয়া পড়িলেন। নিজে ম্যালেরিয়া রোগে রুগ্ন, নাবালক ছেলেরাও রুগ্ন; তাহাদের দ্বারা সেবা শুশ্রূষা সম্ভবপর নহে। ভৃত্যগণ সেবা করিবার ভয়ে পলাইল। একমাত্র ভ্রাতৃজায়ার সাহায্যে দুটী দুটী অন্ন জুটিত, কিন্তু অন্য অসুবিধা বিদূরিত হওয়া অসম্ভব হইল।

বিপিনের মিত্রগণ তাঁহাকে হালিসহরে অসহায় অবস্থায় অবস্থিত দেখিয়া স্থির করিলেন, তাঁহাকে সেইস্থানে আর থাকিতে দেওয়া হইবে না। কারণ, সেবার বড়ই অভাব হইতেছে। এরূপ নিঃসহায় অবস্থায় থাকিলে বিপিন একমাসও বাঁচিতে পারিবেন না।

এইরূপ চিন্তা করিয়া মিত্রগণ তাঁহাকে হালিসহর হইতে কলিকাতায় কার্বালা ট্যাঙ্ক লেনে ২৩ নং ভবনে আনয়ন করিলেন,

ও নিজেরা তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। ভৃত্যগণের উপর বিশেষ নির্ভর না করিয়া যখন তাঁহারা নিজ হস্তেই তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিতেন, তখন বিপিন এক এক সময়ে অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া বলিতেন, আমি কি মহাপাপী, মিত্রগণ আমার বিণ্‌মূত্রও পরিষ্কার করিতেছেন! কিন্তু যখন তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইত, 'তুমি আমাদের যত উপকার করিয়াছ, তাহার তুলনায় এ সেবা শুশ্রূষা কিছুই নহে', তখন তিনি নিস্তব্ধ হইয়া থাকিতেন বটে, কিন্তু 'মিত্র কি ধন! ইহাঁদের প্রেম চির দিনই অচল' ইত্যাদি ভাবিয়া গলদশ্রু হইতেন।

মিত্রগণ সেবা করিতেছেন, তিনি জলভরা আঁখিতে তাহা দেখিতেছেন, এ চিত্রের মত সুদৃশ্য চিত্র আর নাই। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে 'স্বর্গ কোথায়?' তখনই মনে হয়, এই চিত্রের ভিতরেই স্বর্গ।

মিত্রগণ বিপিনের এগার মাস চিকিৎসা করাইলেন। এলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, কবিরাজী—সর্ব্ববিধ চিকিৎসা হইল। বিপিন যে যে দ্রব্য ভাল বাসিতেন, তাহা বন্ধুগণ অকাতরে যোগাইতে লাগিলেন। আম্র ভাল বাসিতেন বলিয়া, বাবু গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমথনাথ তর্কভূষণ, মতিলাল ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি বন্ধুগণ কতই আম্র যোগাইতে লাগিলেন। 'স্ত্রীর অভাবে, পিশীমার অভাবে, সতুর অভাবে তাঁহার সেবা ভাল হইবে না' এ দুঃখ রহিল না। 'অর্থের অভাবে বড় বড় ডাক্তার দেখাইতে পারা গেল না, এ দুঃখও রহিল না। ডাক্তার সত্যশরণ চক্রবর্ত্তী, প্রমথনাথ নন্দী, জগচ্চন্দ্র রায়, যামিনীভূষণ কবিরাজ প্রভৃতি

শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকগণ চিকিৎসা করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের যত্নে তিনি এগার মাস বাঁচিয়াছিলেন। ইহাতে মিত্রগণেরও মনের দুঃখ কতকটা ঘুচিয়াছে।

দৃশ্য—অষ্টাদশ।

পিতা-পুত্রের সম্বন্ধ স্থাপন।

একদিন চব্বিশপরগণার অন্তঃপাতী গড়িয়া হাটে এক নৌকায় একটী কন্যা ও তাহার পিতামাতা কাঁদিতেছিলেন। ইঁহারা জাতিতে ব্রাহ্মণ। রাত্রি অধিক হইয়াছিল, তাঁহাদের সেই ক্রন্দন কাহারও নেত্র বা শ্রোত্র-পথে পতিত হইবার সম্ভাবনা ছিল না। পিতা অপরাহ্নে নৌকা হইতে নামিতে গিয়া মধ্যদেশে আহত হন ও নদীগর্ভে জলমগ্ন হন। পিতাকে জলমগ্ন দেখিয়া কন্যা মাতার সহিত কাতরভাবে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। মাল্লাগণ তাঁহাদিগকে জলে ঝাঁপ দিতে উদ্যত দেখিয়া অভয় দিয়া, পিতাকে জল হইতে উদ্ধার করিল। কিন্তু তাঁহার কোমরে আঘাত হেতু এরূপ বেদনার সঞ্চার হইল যে তিনি উত্থানশক্তিরহিত হইলেন।

নৌকায় পিতা পড়িয়া আছেন, জননী রোরুদ্যমানা কন্যাকে কোলে লইয়া, "হায়! আমাদিগকে এ বিপদে কে রক্ষা করিবে?" বলিয়া বিপত্তারিণীর নাম করিয়া কাঁদিতেছেন, এমন সময়ে নিবারণচন্দ্র দাস নামে একটী আড়তের কর্ম্মচারী নদীর জল লইবার জন্য গাড়ু হাতে তথায় উপস্থিত হইলেন।

তিনি নৌকায় কন্যা ও তাহার মাতাকে করুণস্বরে কাঁদিতে দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মাতা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন, "বাবা, আমরা এই বিপদে পড়িয়াছি, তুমি যদি আমাদিগকে এই বিপদ্ হইতে উদ্ধার কর, আমরা চিরদিন তোমার কেনা হইয়া থাকিব।"

নিবারণচন্দ্র মাতৃসম্বোধনে বলিলেন, "মা! আপনাদিগকে আর কাঁদিতে হইবে না। অদ্য রাত্রি অধিক হইয়াছে, আমাদের আড়তে আশ্রয় গ্রহণ করুন। কল্য প্রভাতে যাহাতে আপনারা নির্ব্বিঘ্নে নিজ গৃহে পোঁছিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিব।" এই বলিয়া নিবারণচন্দ্র লোক জন আনিয়া পিতাকে অতি সন্তর্পণে আড়তে লইয়া গেলেন। মাতা ও কন্যা বিপদে আশ্রয় পাইয়া ক্রন্দন সংবরণ করিলেন।

ভগবানের রাজ্যে বিচিত্র নিয়ম এই, যে ব্যক্তি বিপদে আশ্রয়লাভ করে, তাহার ত কথাই নাই, যিনি বিপদে আশ্রয় দেন, আশ্রিতের প্রতি তাঁহার কেমন একটা টান হয়। এই উপলক্ষে উঁহাদের ভিতর জনক-জননী ও তনয়ের সম্বন্ধ স্থাপিত হইল। নিবারণচন্দ্র কন্যাকে ভগিনী বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন ও তাহার মাতাপিতাকে যেন নিজের মা বাপ বলিয়া ভাবিতে লাগিলেন। বিধাতার নিয়মানুসারে যেখানে এই ভাব হয়, সেখানে কোনও কষ্ট বা অভাব কিরূপে থাকিবে? পিতামাতা নিবারণচন্দ্রকে নিজের তনয়ের মত দেখিতে লাগিলেন, ও যাহা যাহা প্রয়োজন, তাহা ব্যক্ত করিতে সঙ্কোচ করিলেন না।

পিতামাতা ও কন্যা অকূলে কূল পাইয়া নির্ভাবনায় রজনী

যাপন করিলেন। পরদিন নিবারণচন্দ্র উঁহাদের যথাযোগ্য অতিথি সৎকার করিয়া উৎকৃষ্ট যানের সাহায্যে নিজগ্রামে পাঠাইয়া দিলেন। বিদায় দিবার সময় নিবারণচন্দ্র যখন প্রণাম করিলেন, তখন পিতামাতা সাশ্রুলোচনে অনেক আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "বৎস নিবারণচন্দ্র! বাটী যাইবার উপায় হইল বলিয়া যেমন আনন্দ হইতেছে, সেইরূপ আবার তোমাকে ছাড়িয়া যাইতে প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছে। কবে আবার তোমার এই চাঁদ মুখ দেখিতে পাইব?"

নিবারণচন্দ্র করযোড়ে বলিলেন, "পুত্র কি মা বাপ ছাড়িয়া অধিক দিন থাকিতে পারে? আমি শীঘ্রই আপনাদের চরণ দর্শন করিয়া আত্মাকে কৃতার্থ করিব। আপনারা অশ্রু সংবরণ করুন।" কিন্তু পুত্রকে ছাড়িয়া যাইবার সময় মা বাপ কি কখন অশ্রু সংবরণ করিতে পারেন? তাঁহাদের চক্ষে যতই জলধারা, নিবারণচন্দ্র ততই আকুল। পথ দিয়া যাঁহারা যাইতেছিলেন, তাঁহাদের চক্ষে এ দৃশ্য এক অভূতপূর্ব্ব সুদৃশ্য মনে হইতে লাগিল!

পিতাপুত্রের সম্বন্ধ চিরদিনের জন্য স্থাপিত হইয়া গেল। নিবারণচন্দ্র প্রায়ই হরিনাভিতে নূতন মা বাপকে দেখিতে আসিতেন, এবং যে দিন তিনি আসিতেন, ব্রাহ্মণপরিবারে সে দিন উৎসবের দিন হইত।

দৃশ্য—ঊনবিংশ।

সত্যই ঈশ্বর।

কিছুকাল গত হইল হাবড়া বিভাগে এক সুপ্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ জমিদার দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপের সহিত জমিদারি করিতেন। যে সকল প্রজা তাঁহার প্রতিকূলতা করিত, তিনি গবর্ণমেণ্টের সাহায্য না লইয়া স্বয়ংই তাহাদের শাসন করিতেন। কাহারও বা জমি কাড়িয়া লইতেন, কাহারও বা ঘর জ্বালাইয়া দিতেন, কাহাকেও বা কয়েদ করিয়া রাখিতেন। সেই জন্য প্রজারা তাঁহার নামে কাঁপিত। জমিদারবাবু একদিকে যেমন উচ্চণ্ড, অন্য দিকে সেইরূপ কোমলপ্রকৃতিক ছিলেন। তাঁহার বহুবিধ কীর্ত্তিকলাপ ছিল। গবর্ণমেণ্টের সাহায্য ব্যতীত রাজপথ প্রবর্ত্তন, পুষ্করিণী খনন, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, অতিথিশালা স্থাপন করিয়া প্রজাদিগের সুখ সৌভাগ্য বৃদ্ধি করিয়া ছিলেন।

একদিন একটী প্রজা তাঁহার প্রতি অবজ্ঞাসূচক বাক্য প্রয়োগ করিয়া তাঁহার মনে মহাক্রোধের সঞ্চার করে। জমিদার বাবু দ্বারবান্‌দিগকে হুকুম দিলেন অবমানকারক প্রজাকে বাটী হইতে টানিয়া আনিয়া প্রহার করিতে করিতে আমার নিকট আনয়ন কর। দ্বারবানেরা হুকুম প্রাপ্তিমাত্র সেই প্রজার বাটী গিয়া তাহাকে প্রহার করিতে করিতে পথে হেঁচড়াইয়া টানিতে টানিতে জমিদারের বাটীর অভিমুখে আনিতে লাগিল। প্রহার যেরূপ মাত্রায় চলিতে-ছিল তাহাতে প্রজার প্রাণনাশের সম্ভাবনা বুঝিয়া জমিদারেরই

ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহোদয় দ্বারবান্‌দিগকে বাধা দিতে যাইলেন, কিন্তু তাহারা তাঁহার অনুনয় বিনয় অগ্রাহ্য করিয়া কাতরস্বরে রোরুদ্যমান, পথপতিত প্রজাকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। জমিদারের গৃহে উপস্থিতির পর প্রজার কি দশা হইল তাহা কেহই জানিতে পারিল না। আহত প্রজার পুত্রগণ ম্যাজিষ্ট্রেট্ কোর্টে এই বলিয়া অভিযোগ করিল যে আমাদের পিতাকে জমিদার বাবু প্রহার করিতে করিতে বোধ হয় মারিয়া ফেলিয়াছেন। আমাদের পিতাকে সেই অবধি আর দেখিতে পাওয়া যাইতেছেনা।

হেড্‌মাষ্টার বাবু বাধা দিতে গিয়াছিলেন সুতরাং তাঁহাকে প্রধান সাক্ষী মানা হইল। সকলেই ভাবিতে লাগিলেন, হেড্-মাষ্টার বাবু জমিদারেরই বেতনভোগী ভৃত্য। তিনি কি সত্য কথা বলিতে পারিবেন? দেখা যাউক, লেখাপড়া জানা এমন একটা ভদ্রলোক সত্য কথা বলিতে পারেন কি না?

জমিদার বাবু যখন জানিতে পারিলেন হেড্‌মাষ্টার বাবুকে সাক্ষী মানা হইয়াছে তখন তাঁহার অন্তরে ভীতির সঞ্চার হইল। তিনি আমলাদিগকে বলিলেন যত টাকার দরকার হয় হেড্‌মাষ্টার বাবুকে দিয়া যাহাতে তিনি মিথ্যা সাক্ষ্য দেন তাহার চেষ্টা কর। তাঁহাকে মিথ্যা কথা বলাইতে যদি লক্ষ মুদ্রাও ব্যয় হয় তাহাও করিবে। টাকার জন্য পশ্চাৎপদ হইও না।

আমলাগণ মুদ্রা হস্তে হেড্‌মাষ্টার বাবুর দ্বারে উপস্থিত হইল, তিনি তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না। শেষে জমিদার বাবু স্বয়ং তাঁহার দ্বারে উপস্থিত হইলেন এবং বহু অনুনয় বিনয়

করিতে লাগিলেন ও লক্ষ মুদ্রার প্রলোভন দেখাইতে লাগিলেন। যখন প্রলোভন ও মৈত্রীকরণ উভয়ই নিস্ফল হইল, তখন তিনি চক্ষু রাঙাইয়া অঙ্গুলি দ্বারা তর্জন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, দেখুন হেড্মাষ্টার বাবু! আমার প্রতাপে বাঘে গরু একে সঙ্গে জল খায়, আমাকে রাগাইয়া আপনি কোথায় গিয়া বাঁচিবেন? এখনও যদি ভাল চান, লক্ষমুদ্রা গ্রহণ করুন ও আমার চিরদিনের মিত্র হইয়া আমার বহু প্রসন্নতার ফলভোগ করুন।

হেড্মাষ্টার বাবু করযোড় করিয়া বিনীত ভাবে বলিতে লাগিলেন, মহাশয়, আমি আপনার অনেক লুণ খাইয়াছি। আপনার হাতে আমার যদি প্রাণ যায় তাহা অপেক্ষা আমার আর কি সৌভাগ্য হইতে পারে? যাঁহার অর্থ সাহায্যে আমি এতদিন যে জীবন রক্ষা করিতে পারিয়াছি, তাঁহাকেই যদি সেই প্রাণ দিতে পারি, আমি অনৃণী হইয়া সংসারলীলা শেষ করিতে পারিব। ভগবান্ কি আমায় এমন দিন দিবেন! আপনি যেমন আমার পূজ্য, সেইরূপ আমার আর এক জন পূজ্যতম আছেন। আমি তাঁহাকে বড়ই ভয় করি ও প্রাণের সহিত ভালবাসি। তিনি সত্যস্বরূপ। সত্যের প্রতি অনাদর ও তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা একই কথা। আপনি আমার আরাধ্য, কিন্তু তিনি আমার আরাধ্যতম। আপনার নিকটে আমার স্থিতি অল্পদিনের জন্য, কিন্তু তাঁহার নিকটে আমার অবস্থান চিরদিনের জন্য। আমি এই অস্থায়ী প্রাণের জন্য তাঁহাকে চটাইতে পারিব না। আপনি আমাকে ক্ষমা করিবেন। আমি ভগবানের পুত্র ও দাস, তাঁহার অনুমতি ব্যতীত আমি কোনও কার্য্য করিতে পারিব না। যাহাতে আমি

তাঁহার নিকট মুখ দেখাইতে পারি আপনি আমার প্রতি সেই অনুগ্রহ করুন।

এই অশ্রুতপূর্ব্ব বাক্যে জমিদার বাবু একেবারেই মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া রহিলেন। তিনি অবাক্ হইয়া হেড্‌মাষ্টার বাবুকে দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার নির্নিমেষ লোচনদ্বয় মাষ্টার বাবুর মুখে প্রোথিত হইয়া গেল। তিনি উহার মুখে কি যে স্বর্গের ছবি দেখিতে লাগিলেন তাহা কাহারও ব্যক্ত করিবার সাধ্য নাই। হেড্‌মাষ্টার বাবুর মুখ যতই দেখেন, ততই তাঁহার অশ্রুভরা চক্ষু গুণ-পক্ষপাতিতা জ্ঞাপন করিতে লাগিল। শেষে জমিদার বাবু অধীর হইয়া তাঁহার হাত দুই খানি ধরিয়া বলিলেন, মাষ্টার বাবু, আপনি মানুষ নন, আপনি সাক্ষাৎ দেবতা। আপনি আমার নিকট প্রতিজ্ঞা করুন, আমার এই বিদ্যালয় কখনই ছাড়িবেন না? আমার অদৃষ্টে যে শাস্তিই থাকুক আমি তাহা অবলীলা ক্রমে বহন করিতে পারিব, যদি আমার মনে জাগরূক থাকে যে, আপনার ন্যায় এক দেবতা আমার জমিদারিতে বাস করিয়া ইহাকে স্বর্গভূমি করিয়া রাখিয়াছেন।

এই বাক্যে হেড্‌মাষ্টার বাবুর মস্তক অবনত হইল। তিনি কোনও উত্তর দিতে পারিলেন না। জমিদার বাবু উক্ত শিক্ষকের সাক্ষ্যে রাজবিচারে দণ্ডিত হইয়া কিছুদিন কারাগারে অবস্থান করিতে বাধ্য হইলেন। বহু ক্লেশ পাইয়া শেষে যখন কারাগার হইতে মুক্তি পাইলেন তখন তিনি নিজ জমিদারিতে আসিয়া অগ্রেই সন্ধান লইলেন, 'সেই দেব পুরুষ হেড্‌মাষ্টার বাবু এখানে আছেন কি না?' কিন্তু যখন শুনিলেন তিনি এ পাপ ভূমি

ত্যাগ করিয়া অন্য স্থানে গিয়াছেন, তখন তিনি হা হতোঽস্মি করিয়া বলিতে লাগিলেন, ভগবান্ আমাকে কারাগারে নিক্ষেপ করিয়া তত শাস্তি দেন নাই, আজ আমার জমিদারি দেবশূন্য করিয়া যত শাস্তি দিলেন।

হেড্ মাষ্টার বাবু এক্ষণে কোথায় আছেন তাহার সন্ধান লইয়া তাঁহাকে আনিবার জন্য জমিদার স্বয়ং তথায় উপস্থিত হইলেন। কিন্তু তিনি কিছুতেই পূর্ব্ব বিদ্যালয়ে আসিতে সম্মত হইলেন না। তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন, জমিদার বাবু রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া হয়ত পাপশূন্য হইয়াছেন, কিন্তু মহাজনেরা বলিয়া থাকেন, "দধির হাঁড়ি যতই মাজা ঘসা হউক তাহাতে দুধ রাখিতে নাই।" রাজদণ্ডে ইনি যতই মাজা ঘসা হউন, ইঁহার সংসর্গে থাকিতে নাই।

কয়েকটী ক্ষুদ্র অথচ মনোরম দৃশ্য।

[১]

একদিন একটী ভদ্র লোক দুইটী ছোট ছোট ছেলে সঙ্গে লইয়া সিয়ালদহ ষ্টেশনে ট্রেণ হইতে নামিলেন ও টিকেট্ কলেক্টারের নিকট যাইয়া তিন জনে তিনখানি টিকিট্ দিলেন। দুইটী ছেলের মধ্যে একজন একখানি হাফ্ টিকেট্ দিল ও আর একটী ছেলে একখানি ফুল টিকেট্ দিল ও নিজে একখানি ফুল টিকেট্ দিলেন। টিকেট্ কলেক্টার ইহাঁদের গমনে বাধা দিয়া বলিলেন, মহাশয়, আপনি একটু দাঁড়ান, আমি টিকেট্ [illegible] করিয়া লই। যে ছেলেটী আমাকে হাফ টিকেট্

দিল, এটী অপর অপেক্ষা অধিক বয়স্ক বলিয়া মনে হয়, কিন্তু এ ছেলেটী হাফ্ টিকেট্ লইয়াছে, আর যে ছেলেটী রোগা, উহা অপেক্ষা অল্প বয়স্ক দেখাইতেছে, সে ফুল টিকিট্ লইয়াছে কেন ?

ভদ্র ব্যক্তি বলিলেন আমার এই রোগা ছেলেটী আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র। এ বার বৎসর অতিক্রম করিয়া তের বৎসরে পদার্পণ করিয়াছে। কিন্তু যাহাকে হৃষ্ট পুষ্ট দেখিতেছেন, এ আমার মধ্যম পুত্র। ইহার এখনও দ্বাদশ বৎসর পার হয় নাই। আপনাদের নিয়ম আছে বার বৎসর পূর্ণ হইলেই ফুল টিকেট্ লইতে হইবে। সেই নিয়মানুসারে আমার বড় ছেলে দেখিতে ছোট হইলেও উহাকে ফুল টিকেট্ কিনিয়া দিয়াছি।

টিকেট্ কলেক্টার ভদ্রলোকের প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয়, আজ এ নূতন ব্যাপার দেখিলাম। আপনার নিবাস কোথায় ?

ভদ্রব্যক্তি বলিলেন আমার বাড়ী দক্ষিণ দেশে।

টিকেট্ কলেক্টার স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন, শেষে বলিতে লাগিলেন মহাশয়, আজ আপনি দক্ষিণে লোকদিগকে যে কত উচ্চ আসনে বসাইলেন তাহা বর্ণনা করিতে পারিতেছি না। আপনার আত্মীয় স্বজনও বোধ হয় আপনার ন্যায় সত্যপ্রিয়। যেখানে বহু সত্যপ্রিয় লোকের বাস, তাহা নিশ্চয়ই স্বর্গ।

[২]

একদিন একটী ভদ্রলোক ট্রামগাড়ীর ভিতর গিয়া বসিলেন। তিনি যেখানে উঠিয়া বসিলেন সেখানে দুই বেঞ্চেই আর অন্য লোক ছিল না। টিকেট্ বিক্রেতা টিকেট্ দিবার জন্য তাঁহার

নিকট উপস্থিত হইলেন। ভদ্রব্যক্তি দুইখানি টিকেট্ কিনিলেন। টিকেট্ বিক্রেতা এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া আর জনমানব দেখিতে না পাইয়া জিজ্ঞাসিলেন, "মহাশয়, আর ত কাহাকেই দেখিতে পাইতেছি না, তবে আপনি কাহার জন্য আর একখানি টিকেট্ কিনিলেন?"

ভদ্রব্যক্তি বলিলেন, "গত রাত্রিতে আমি ট্রামগাড়ী করিয়া একস্থানে গিয়াছিলাম। আমার নিকট টাকা ছিল। টিকেট্ বিক্রেতার নিকট খুচরা পয়সা বা সিকি দুয়ানি না থাকাতে তিনি আমার টাকাটা লইতে অস্বীকার করিলেন, টিকেট দিতেও পারিলেন না। ট্রাম গাড়ীর কর্তৃপক্ষীয়গণের নিকট আমি এক টিকিটের মূল্যবিষয়ে ঋণী আছি। এক্ষণে সেই ঋণ শুধিবার সুবিধা পাইলাম, তাই দুইখানি টিকেট্ কিনিলাম। ছোট ঋণও ঋণ, বড় ঋণও ঋণ; ঋণে আবদ্ধ থাকিলে মানুষের অধোগতি হয়। আমি ঋণ শুধিতে পারিলাম বলিয়া বড়ই আনন্দলাভ করিতেছি।"

টিকেট্ বিক্রেতা ছল ছল নয়নে তাঁহার দিকে তাকাইলেন, এবং বলিতে লাগিলেন, "মহাশয়, অনেক ভদ্রব্যক্তি দেখিয়াছি, কিন্তু এত সামান্য অন্যায় কাজ করিতে কুণ্ঠিত লোক ত নজরে পড়ে না! আমি আজ অপনাকে দেখিয়া ধন্য হইলাম। আপনাকে যতই দেখিতেছি, ততই আমার দর্শন-স্পৃহা বাড়িতেছে।"

[৩]

একদিন প্রত্যক্ষ দেবতা পূজ্যপাদ পিতৃদেব মহেশচন্দ্র চূড়ামণি এক প্রান্তরের মধ্য দিয়া আসিতেছিলেন। শীতকাল,

সন্ধ্যা উপস্থিত। তিনি দেখিলেন, কেহ একটী বিড়ালছানা প্রান্তরমধ্যে ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছে।

বিড়ালছানা পিতাঠাকুরকে দেখিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে লাগিল। তিনি যে দিকে যান, সেই দিকেই তাহার গতি দেখিয়া তিনি বুঝিলেন, বিড়ালছানাটী শরণাগত হইয়াছে। তিনি আর থাকিতে পারিলেন না, শাবকটী কোলে তুলিয়া লইয়া, পাছে শীতে কষ্ট পায় সেই জন্য নিজ গাত্রাবরণ বনাতের মধ্যে ঢাকিয়া রাখিলেন। তিনি পথ চলিতে চলিতে ভাবিতে লাগিলেন, ভগবান্ একটী বিড়াল-শাবক রক্ষার্থও যেমন ব্যস্ত, একটী মনুষ্যশিশুর প্রাণ বাঁচাইতেও সেইরূপ সাগ্রহ। ভগবান্ যখন ইহার প্রাণরক্ষার ভার আমার হাতে দিলেন, তখন ইহার প্রতি অবহেলা করিলে, আমি তাঁহার শ্রীচরণে অপরাধী হইব। আমি যদি বিড়াল-শাবককে নগণ্য ভাবিয়া তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিয়া চলিয়া যাইতাম, তবে নিশ্চয়ই শৃগাল আসিয়া নখদংষ্ট্রাঘাতে খণ্ড খণ্ড করিয়া ইহার প্রাণসংহার করিত। ভগবন্! কি ক্ষুদ্র কি মহান্, সমস্ত প্রাণীর জন্যই তুমি সর্ব্বদা চিন্তিত!

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে পিতাঠাকুর মহাশয় প্রায় দুই মাইল পথ অতিক্রম করিয়া নিজ গৃহে উপস্থিত হইলেন এবং আমার পরমারাধ্যা জননীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দেখ গৃহিণি, এই বিড়ালশাবকটী বিপন্ন হওয়াতে ভগবান্ ইহার রক্ষার ভার আমাদের হস্তে নিক্ষেপ করিয়াছেন। ইহাকে তুচ্ছ জীব ভাবিয়া ইহার প্রতিপালনে কোনও প্রকার ঔদাস্য করিও না।"

জননী উত্তর করিলেন, "আমার ছেলের ভিতর পাঁচটীর মধ্যে আর একটী সন্তান বাড়িল। এই বলিয়া তিনি সত্বর দুগ্ধ আনিয়া পলিতায় ভিজাইয়া তাহাকে খাওয়াইতে লাগিলেন, শুষ্ককণ্ঠ বিড়াল-শাবক সাগ্রহে তাহা পান করিতে লাগিল, মাতা ও পিতার নেত্র বারিধারায় পূর্ণ হইয়া গেল। তখন আমি ক্ষুদ্র বালক হইলেও সেই স্বর্গীয় চিত্র আমার হৃদয়কে অধিকার করিয়া ফেলিল। আমি নিশ্চল নয়নে তাঁহাদের সেই মূর্ত্তি দুইখানি যতই দেখিতে লাগিলাম, ততই ভাবে বিভোর হইতে লাগিলাম। প্রায় পঞ্চষষ্টি বৎসর গত হইল, আজও সেই চিত্র ভুলিতে পারিতেছি না।

[৪]

একদিন কলিকাতায় কলেজষ্ট্রীটে এক বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। বন্ধুকে দেখিয়া সাগ্রহে তাঁহাকে আলিঙ্গনাদি করিয়া আনন্দে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেমন ভাই, বাড়ীর সংবাদ ভাল ?" বন্ধু গলদশ্রু হইয়া বলিলেন, "আর ভাই, ভাল আর কোথায় ?" আমি ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসিলাম, "ভাই, কি হইয়াছে ? কেহ কি সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছে ? বন্ধু অশ্রুজল মুছিতে মুছিতে বলিতে লাগিলেন, ভাই, আমার সেই অশেষ-গুণধাম জামাতা প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছেন। "কি পীড়া হইয়াছিল ?" জিজ্ঞাসান্তে তিনি বলিতে লাগিলেন। ভাই আজকাল বাঙ্‌লা দেশে কি যে এক হাওয়া উঠিয়াছে! যুবকবৃন্দ পরের জন্য নিজের প্রাণ অবলীলাক্রমে বিসর্জ্জন দিতেছে। সেদিন আমাদের পাড়ায় গৃহদাহ হয়; দহ্যমান গৃহে একটী বালক

অগ্নিদাহে মরিতে বসিয়াছে বুঝিতে পারিয়া, আমার গুণধর জামাতা তাহার উদ্ধারার্থ অগ্নিশিখাব্যাপ্ত সেই গৃহমধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়ে ও বালকটীকে উদ্ধার করে। কিন্তু নিজে এত দগ্ধ হইল যে, তাহাতে তাহার প্রাণবায়ু কোথায় উড়িয়া গেল। আমরা তাহার দগ্ধ দেহে কোনও রূপ ক্লেশের লক্ষণ দেখিতে পাইলাম না। মুখখানি দেখিয়া মনে হইতে লাগিল, বাবা যেন হাসিতেছে। যে পরের প্রাণরক্ষার্থ নিজের প্রাণ বিসর্জ্জন দেয়, তাহার মনে কি এতই তৃপ্তি হয় যে, দৈহিক যন্ত্রণা একেবারেই থাকে না? সে বুঝি তখন মর্ত্ত্যজগতে থাকে না, স্বর্গধামে বিচরণ করে! তাহার মুখকমলে সেই স্বর্গের ছবিখানি কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছি না।

দৃশ্য—বিংশ।

গুরুগৃহ-চিত্র।

শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম ভাটপাড়ায় গুরুবংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা অতি সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি পুত্রকে সর্ব্বদা কাছে রাখিতেন এবং মুখে মুখে ব্যাকরণ ও কাব্য পড়াইতেন। জন্ ষ্টুয়ার্ট মিলের পিতা জেম্‌স্ মিল্ ইঁহারই অবলম্বিত প্রণালীমত যেমন পুত্রকে অদ্বিতীয় করিতে পারিয়াছিলেন, ইনিও সেইরূপ পুত্রকে অদ্বিতীয় করিবার

পথে দাঁড় করাইয়া যান। যখন সার্ব্বভৌম মহাশয়ের বয়ঃক্রম আট বৎসর, তখন ইঁহার ব্যাকরণ ও কাব্য অধ্যয়ন শেষ হইয়া যায়। পুত্র অসামান্য মেধাবী ছিলেন বলিয়া পিতা পুত্রকে শিক্ষা দিতে একবিন্দুও সময় নষ্ট করিতেন না। একাদশ বৎসর বয়ঃক্রমে পুত্র "পাণ্ডব-বিজয়" নামে এক সংস্কৃত নাটক প্রণয়ন করিলেন। এই গ্রন্থে তিনি প্রাকৃত সংস্কৃত ও সংস্কৃত কবিতা যেরূপ সরল ভাবে লিখিয়াছেন, তাহা যাঁহারাই পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই একেবারে অবাক্ হইয়া গিয়াছেন। বহু পণ্ডিত তাঁহাকে দ্রষ্টব্য বিবেচনায় দেখিতে আসিতেন।

ব্যাকরণ ও কাব্য শেষ করিয়া ও উহার ফল বাহির করিয়া সার্ব্বভৌম মহাশয় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। গুরু যেমন অদ্বিতীয়, ছাত্রও তদ্রূপ অতুলনীয়। গুরু অধ্যাপনা করিয়া যেরূপ তৃপ্তিলাভ করিতে লাগিলেন, ছাত্রও তদ্রূপ পাঠ করিয়া চিত্তপ্রসাদ লাভ করিতে লাগিলেন। "এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ।" অতি স্বল্প দিনের মধ্যেই শিষ্য ন্যায়-শাস্ত্রে মহা ব্যুৎপন্ন হইলেন ও গুরুর অনুমতি লইয়া সপ্তদশ বর্ষে ন্যায়শাস্ত্রের টোল খুলিলেন। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ, প্রসিদ্ধ পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন প্রভৃতির ন্যায় পরম মেধাবী ছাত্র তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া ন্যায়শাস্ত্রে খ্যাতনামা হইতে লাগিলেন। ন্যায়শাস্ত্রাধ্যাপনে সার্ব্বভৌম মহাশয়ের সুযশঃ শুনিয়া অনেকগুলি মেধাবী ছাত্র আসিয়া যুটিলেন। গুরু তাঁহাদের আহারাদি যোগাইতে বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। ব্রাহ্মণ

পণ্ডিতের বিদায় ও মন্ত্রশিষ্যদিগের প্রণামী ভিন্ন তাঁহার আর কোনও প্রকার অর্থাগম ছিল না; সুতরাং ছাত্রদিগকে অন্ন দিতে তাঁহাকে বিলক্ষণ কষ্টে পড়িতে হইল। পিতার উপার্জ্জিত তৈজস-পত্রাদি বিক্রয় করিয়া কিছুদিন খরচ পত্র চালাইলেন। পত্নীর যাহা কিছু অলঙ্কার ছিল, নিঃশেষ হইতে লাগিল। অনেকগুলি মেধাবী ছাত্র পাওয়াতে তিনি অধ্যাপনায় একেবারেই মগ্ন হইয়া থাকিতেন, অর্থোপার্জ্জনার্থ কোনও চেষ্টা করা অসম্ভব হইয়া উঠিল।

তিনি ছাত্রদিগের অধ্যাপনা-কার্য্যে এক এক দিন উন্মত্তবৎ হইয়া পড়িতেন। রাত্রি একটার সময়ে হঠাৎ টোলে উপস্থিত হইয়া ছাত্রদিগকে জাগাইতেন এবং বলিতেন, "আজ তোমাদিগকে যে পাঠ শিক্ষা দিয়াছি, তাহা ঠিক আয়ত্ত করিতে পারিয়াছ কি? ন্যায়শাস্ত্রের মধ্যে এই পাঠটী অধিগত হইলে এত বড় দুরূহ শাস্ত্র একেবারে জল হইয়া যাইবে।" ছাত্রগণ যখন অধিগত পাঠ সুব্যক্ত করিয়া গুরুকে সন্তুষ্ট করিলেন, তখন তিনি বলিলেন, "এই সমস্ত লিখিয়া আমাকে দেখাও। লোকে বলে 'লেখা পড়া', কিন্তু আমার মতে 'পড়া লেখা'। যাহাই পড়িবে, তাহাই লিখিবে; না লিখিলে অধ্যয়ন সম্পূর্ণ আয়ত্ত হয় না।" জেম্‌স্ মিলও ঠিক এই প্রণালী অবলম্বন করিতেন। তিনি পুত্রকে সমস্ত দিন পথে ঘাটে যে উপদেশ দিতেন, ঘরে আসিয়া তাহা লিখিতে বলিতেন।

এইরূপ মহা উৎসাহে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা-কার্য্য চলিতে লাগিল। ছাত্রদিগের প্রতিপালনের জন্য তাঁহার সঞ্চিত সমস্ত তৈজস পত্র ও পত্নীর অলঙ্কার নিঃশেষ হইল। হাত দুইখানি

অলঙ্কারশূন্য হওয়াতে তাঁহার পত্নী হাতে লাল সূতা বাঁধিলেন। ছাত্রদিগের পরিচর্য্যা তাঁহার ব্রত ছিল। যে দিন হাতে লাল সূতা বাঁধিলেন, সে দিন তাঁহার মুখে হাসি আর ধরে না। তিনি সেই অবস্থায় যখন ছাত্রদিগকে অন্ন ব্যঞ্জন পরিবেষণ করিতে আসিলেন তখন তাঁহার প্রসন্ন বদন যেই দেখিয়াছিল, সেই এই দৃশ্যে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। লালসূতা-বাঁধা হাতে অন্নের থালা, মুখে স্বর্গের হাসি, হৃদয়ে পরম তৃপ্তি, যেই দেখিতে লাগিল, তাহার হৃদয়ে কি যে এক ভাবের উদয় হইল, তাহা বর্ণনা করিবার সাধ্য নাই। কি সুদৃশ্য!

ছাত্রগণ গুরুপত্নীকে মা মা বলিয়া ডাকিত। তিনিও তাহাদিগকে আপনার পুত্রের মত যত্ন করিতেন। গুরুগৃহে সামিষ আহার প্রচলিত ছিল না। গুরুপত্নী নিরামিষ অন্নব্যঞ্জনাদি এমন সুন্দর পাক করিতেন যে, ছাত্রগণ তাহা অমৃত মনে করিত। যে দিন বড়ি দিয়া কাঁচা তেঁতুলের অম্ল রাঁধিতেন, সে দিন অন্নে টান পড়িত এবং গৃহিণীকে উপবাসে থাকিতে হইত। ছাত্রগণ যখন জানিতে পারিত, মা আমাদের সমস্ত অন্নদান করিয়া উপবাসী আছেন, তাহারা তাঁহার নিকট অপ্রস্তুত ভাব প্রকাশ করিলে, তিনি স্বর্গের হাসি হাসিতে হাসিতে বলিতেন, "বাবারা, তোরা খেলেই আমার খাওয়া হ'য়ে যায়। তোরা যেরূপ মহা আনন্দে আমার যৎসামান্য শাকান্ন ভোজন করিস্ তাহা দেখিয়া আমার কি আর ক্ষুধা তৃষ্ণা থাকে? তোরা আমাকে রোজ এইরূপ উপবাসে রাখিলে আমি কি যে সুখী হইব, তা তোদের কাছে কি বলিব?"

সাত্ত্বিক আহারে ও ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শয্যাত্যাগ করিয়া শৌচান্তে গঙ্গাস্নান ও পূজাহ্নিক কার্য্যে ছাত্রদিগের দেহ রোগশূন্য থাকাতে তাহারা অধিকতর মেধাবী হইতে লাগিল। তাহাদের বিদ্যাবত্তা ও চারিত্রে গুরুর মুখ উজ্জ্বল হইল। তিনি তাহাদের মুখ দেখিয়া দারিদ্র্যের মহাকষ্ট বিস্মৃত হইতেন। কিন্তু যে দিন ছাত্রদিগকে অন্ন দিবার জন্য টোলের গাড়ুটী পর্য্যন্ত বিক্রয় করিতে হইল, সেদিন জগজ্জননী মা অন্নপূর্ণার আসন টলিল। জগন্মাতা অন্নদায়িনী আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি গুরুশিষ্যের কলাপাতে আহার সহ্য করিলেন, গুরুপত্নীর হাতে লালসূতা বাঁধা ও উপবাসী থাকাও সহ্য করিলেন, কিন্তু হস্ত-মুখ-প্রক্ষালনাদির জন্য যে গাড়ুটী মাত্র অবশিষ্ট ছিল, তাহার বিক্রয় আর সহ্য করিতে পারিলেন না। তাঁহার আসন এমন টলিল যে, তিনি অস্থির হইলেন। তাঁহার কটাক্ষে সার্ব্বভৌম মহাশয়কে মূলাযোড় সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদে বরণ করা হইল। মূলাযোড় কলেজের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়কে সার্ব্বভৌম মহাশয়ের গৃহে পাঠাইয়া দিলেন। তিনি উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "সার্ব্বভৌম মহাশয়, আপনাকে আর দারিদ্র্যক্লেশ সহ্য করিতে হইবে না। আপনি মূলাযোড় সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ (প্রিন্সিপাল) নিযুক্ত হইয়াছেন। আপনার যশঃ দিগ্‌দিগন্তর ছাইয়া ফেলিয়াছে। আপনিই সে কাজের সম্পূর্ণ উপযুক্ত বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছেন।" সার্ব্বভৌম মহাশয় হাত দুইখানি যোড় করিয়া বলিলেন, ন্যায়রত্ন মহাশয়! আমি বেশ আছি; এই সব

সোণার চাঁদ ছাত্রদের মুখ দেখিয়া দারিদ্র্যক্লেশ ক্লেশ বলিয়াই মনে হয় না। বিশেষতঃ আমার সহধর্ম্মিণী যখন লালসূতা-বাঁধা হাতে অন্নের থালা ধরেন, তাহা দেখিয়া আমার যে আনন্দ হয়, সে আনন্দ অতুল ঐশ্বর্য্য দিতে পারিবে না।" ন্যায়রত্ন মহাশয় কিছুতেই ছাড়িলেন না; সার্ব্বভৌম মহাশয় মুলাযোড় কলেজের অধ্যক্ষ হইলেন। মা অন্নপূর্ণার প্রসন্নতায় তাঁহার দারিদ্র্যদুঃখ ঘুচিয়া গেল, তাঁহার সমস্ত ঋণ শোধ হইল; অথচ ছাত্র পড়াইবার জন্য যে ব্যগ্রতা, তাহা অটুট রহিয়া গেল।

দৃশ্য—একবিংশ।

আতিথেয়তা।

আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ আতিথেয়তাকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্মরূপে পরিগণিত করিয়াছেন এবং অতিথিকে "সর্ব্বদেবময়োঽতিথিঃ" অর্থাৎ সমস্ত দেবতা এক দিকে আর অতিথি এক দিকে, উভয়ই সমান পূজ্য বলিয়া, ভক্তি-নয়নে দেখিতেন। যিনি যতই নিঃস্ব হউন, আহারের সময়ে অতিথির জন্য একটা ভাগ রাখিতেন। নিজের অন্ন বাড়িয়া, একটা গাভী দোহন করিতে যে সময় অতীত হয়, অন্ততঃ সেইটুকু সময় অতিথির জন্য অপেক্ষা করিতে হইত; ইচ্ছা করিলে, তাহার অধিকক্ষণ অপেক্ষা করিলেও করিতে পারিতেন। অতিথিসেবা হিন্দুদিগের মর্জ্জাগত হইয়া আছে। বিদেশে যাইয়া যদি কোনও বাঙ্গালীর সহিত সাক্ষাৎ হয়, তবে

করিবেনই করিবেন। যদি নিতান্তই কাজের ক্ষতি বিবেচনা করেন, তবে কার্য্যসম্পাদনান্তে আসিতেই হইবে, এইরূপ নিমন্ত্রণ করিয়া রাখেন, এবং তাঁহাকে পাইলে আকাশের চাঁদ পাইলেন, মনে করেন। তিনি যদি আবার দেশের লোক হন, তবে ত তাঁহার জন্য পাগল হইয়া পড়েন।

মনে হয়, একদিন কার্য্যোপলক্ষ্যে নড়াল হইতে বনগাঁ ষ্টেশনে উপস্থিত হই। গাড়ী ছাড়িতে বিলম্ব আছে দেখিয়া জলপানার্থ এদিক্ ওদিক্ তাকাইতেছি, এমন সময়ে একটী ষ্টেশনের কর্ম্মচারী নেত্রপথে পতিত হইলেন। আমি জলপানার্থ তাঁহার অতিথি হইলাম; জলপানান্তে তাঁহাকে যেন কোথায় দেখিয়াছি বলিয়া মনে হইল। তিনিও যেন আমার মুখ চেনা চেনা ভাবিতে লাগিলেন। পরে যখন আলাপ হইল, তখন পরস্পর জানিতে পারা গেল, আমরা এক দেশের লোক। উঁহার বসতবাটী আমার বসতবাটী হইতে ছয় ক্রোশ মাত্র দূরে।

স্বদেশবাসীকে পাইয়া তিনি যে কোথায় রাখিবেন, তাহা স্থির করিতে পারিলেন না; ইচ্ছা, আমাকে দুই একদিন ধরিয়া রাখেন ও আনন্দে দিন অতিবাহিত করেন। কিন্তু আমার কার্য্যের বিশেষ ক্ষতি হইবে জানিতে পারিয়া বড়ই দুঃখিত হইলেন। যে সময়টুকু তাঁহার কাছে ছিলাম, কতই যত্ন, কতই আদর করিতে লাগিলেন। সেই প্রাণের আদর আজ চল্লিশ বৎসর হইল, ভুলিতে পারা গেল না।

ট্রেণ ছাড়িবার ঘণ্টা বাজিল, তিনি আমাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া ফুট্‌বোর্ডে দাঁড়াইয়া রহিলেন ও আমার দিকে একদৃষ্টে

তাকাইয়া অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। গাড়ী চলিতে লাগিল, তথাপি তিনি নামিলেন না। শেষে যখন গাড়ী দ্রুত চলিতে লাগিল, তখন তিনি অনন্যোপায় ভাবিয়া গাড়ী হইতে লম্ফ দিয়া পড়িলেন ও যতক্ষণ আমি দৃষ্টির বহির্ভূত না হইলাম, আমার দিকে সজল-নয়নে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিলেন। সে চিত্র এ জীবনে ভুলিবার নয়। পর-জীবনে কি হয়, জানি না। অতিথিসেবা উপলক্ষ্যে কত লোক যে আপনার হইয়া যায়, তাহা গণনা করিয়া শেষ করা যায় না।

এই আতিথেয়তা পরম ধর্ম্মরূপে আজিও বঙ্গের বহুস্থানে প্রচলিত আছে।

এক দিন পূর্ব্ববঙ্গে একটী ব্রাহ্মণ এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের গৃহে অতিথি হন। ব্রাহ্মণ গৃহে ছিলেন না; ব্রাহ্মণী সাদরে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া চণ্ডীমণ্ডপে বসিবার জন্য আসন দিলেন ও স্বয়ং পাদ্য আনিয়া তাঁহার চরণ ধৌত করিয়া দিয়া ঘর্ম্ম নিবারণার্থ ব্যজন করিতে লাগিলেন। তাঁহার চক্ষু দিয়া দুই এক ফোঁটা জল পড়িতেছিল। গৃহে অন্ন নাই, অথচ অতিথি উপস্থিত হইয়াছেন; ব্রাহ্মণও ঘরে নাই। ব্রাহ্মণের আসিতে যতই বিলম্ব হইতে লাগিল, ব্রাহ্মণী ততই আকুল হইয়া অবগুণ্ঠন-মধ্যে কাঁদিয়া ভাসাইতে লাগিলেন। এমন সময়ে ব্রাহ্মণ সামান্য তণ্ডুল হস্তে গৃহে উপনীত হইলেন। ব্রাহ্মণের হস্তে তণ্ডুল দেখিয়া ব্রাহ্মণী আনন্দে আটখানা হইলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, 'স্বামী যে তণ্ডুল আনিয়াছেন, তাহাতে অতিথির ত সেবা হইবে?

আমরা না হয় দুই জনে উপবাসী থাকিব। অতিথি ঠাকুরকে ত ফিরিতে হইবে না ?'

গৃহস্থ-ব্রাহ্মণ ভগ্ন চণ্ডীমণ্ডপে উপবিষ্ট অপরিচিত ব্রাহ্মণকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়ের নিবাস ?" নবাগত ব্রাহ্মণ নিজের দেশের নাম উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "আমি এই মধ্যাহ্নকালে ক্লান্ত হইয়া আপনার গৃহে অতিথি হইয়াছি।"

গৃহস্থ চীৎকার করিয়া বলিলেন, "আমার ঘরে অতিথি!" এই বলিয়া তিনি বাটীর ভিতর যাইলে, অতিথি তাঁহার এই চীৎকারে ভীত হইয়া অন্যত্র যাইবার কল্পনা করিতেছেন জানিতে পারিয়া, ব্রাহ্মণ-পত্নী তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন, "অতিথি ঠাকুর! আপনি আমার স্বামীর চীৎকারে অন্য কিছু ভাবিবেন না। তাঁহার ঐ চীৎকার আনন্দের চীৎকার। আমাদের এ ভগ্ন কুটীর দেখিয়া কখনও অতিথি আসেন না। আজ আমাদের বহু পুণ্যের বলে ভগবান্ একটী অতিথি দিয়াছেন, সেই আনন্দে আমার স্বামী এইরূপ চীৎকার করিয়াছেন। আপনি যখন পদধূলি দিয়া এ বাটী পবিত্র করিয়াছেন, তখন আর আমাদিগকে এই সৌভাগ্যলাভে বঞ্চিত করিবেন না।" এই বাক্যে প্রস্থানোদ্যত অতিথি তথায় রহিয়া গেলেন।

গৃহস্থ-ব্রাহ্মণের কয়েকটী দুগ্ধবতী গবী ছিল। সেই গোদুগ্ধে তাঁহার ঘরে ঘৃত, মাখন, ক্ষীর, ছানা, দধি প্রস্তুত থাকিত। সুতরাং তণ্ডুল যখন মিলিয়াছে, তখন অতিথি পরিচর্য্যার আর ভাবনা রহিল না। ব্রাহ্মণী মহা আগ্রহের সহিত শাকান্ন প্রস্তুত করিলেন ও অতিথির সম্মুখে স্থাপন করিয়া তাঁহাকে ব্যজন

করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ মাখন, ঘৃত পরিবেষণ করিলেন। গৃহজাত উৎকৃষ্ট মাখনে ও হৈয়ঙ্গবীন অর্থাৎ সদ্যোজাত ঘৃতের সাহায্যে শাকান্ন অতিথির অমৃতবৎ মনে হইতে লাগিল। 'এরূপ উৎকৃষ্ট ভক্ষ্য জীবনে কখন গলাধঃকরণ করি নাই, আঃ কি অমৃতই খাইতেছি,' বলিয়া অতিথি মুহুর্মুহুঃ আত্মতৃপ্তি জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন। গৃহস্থও পত্নীর সহিত কর্ণামৃত পান করিয়া স্বর্গে অবস্থান করিতে লাগিলেন। অবশেষে দধি, দুগ্ধ, ক্ষীর, সর দ্বারা অতিথির পরিতৃপ্তি পরা কাষ্ঠায় উপনীত হইলে তাঁহাদের আর আনন্দের সীমা রহিল না।

অতিথির ভোজনক্রিয়া শেষ হইল। তাঁহার বিশ্রামার্থ একখানি পরিষ্কার কন্থা দ্বারা শয্যা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হইল। গৃহিণী প্রণামান্তে অপর গৃহকর্ম্ম সম্পন্ন করিতে যাইলেন; ব্রাহ্মণ অতিথির নিকট বসিয়া মিষ্ট কথায় তাঁহার পরিতোষ উৎপাদন করিতে লাগিলেন।

অতিথি বলিলেন, "মহাশয়, আপনার পত্নীর নিকট শুনিলাম, আপনারা নিঃস্ব; কিন্তু দারিদ্র্যের ত কোনও চিহ্ন দেখিতে পাইলাম না। এরূপ সাত্ত্বিক আহার বড় মানুষের ঘরেও মিলে না। আপনারা গরিব কিসে, আমি ত কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। আপনার এই গরুগুলি পুষিতে যে ব্যয় হয়, তাহাতে একজন বড় মানুষের সংসার অবলীলাক্রমেই চলিয়া যায়।"

ব্রাহ্মণ সাশ্রুনয়নে বলিতে লাগিলেন, "অতিথি ঠাকুর, আমাদের ন্যায় নিঃস্ব এ গ্রামে আর কেহই নাই। আমাদের ঘর দ্বার দেখিয়াই বুঝিতে পারিতেছেন। গরুগুলি প্রতিপালন করিতে

আমার এক পয়সাও খরচ হয় না। ইহারা মাঠে চরিয়া আসিয়া আমাকে দুধ যোগায়। অন্নের অভাবে গোদুগ্ধই আমাদিগের প্রাণদান করিতেছে।”

অতিথি বলিলেন, “যাঁহার এতগুলি গরু, তাঁহাকে নিঃস্ব কিরূপে বলিব? আপনি যদি গরুও না বিক্রয় করেন, কেবল দুগ্ধ বিক্রয় করিলেই আপনার টাকা ঘরে ধরিবে না।”

অতিথির এই বাক্যে ব্রাহ্মণ জিব কাটিয়া বিস্ময়-সঙ্কুচিত-নেত্রে বলিতে লাগিলেন, “আপনি ব্রাহ্মণ হইয়া এই কথাটা মুখে আনিলেন!! ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজন, যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ। এতদ্ব্যতীত ব্রাহ্মণ অন্য কার্য্য করিবেন না। ক্রয় বিক্রয় প্রভৃতি ব্যবসায়-কার্য্য বৈশ্যের। আপনি কি আমাকে ব্রাহ্মণত্ব ছাড়িয়া বৈশ্য হইতে উপদেশ দেন?—এত বড় একটা পবিত্র বংশকে পাতিত করিতে পরামর্শ দেন? গো-বিক্রয়ের অর্থ—আপনার গরুটীকে কসাইয়ের হাতে তুলিয়া দেওয়া। এই জন্য ব্রাহ্মণ গো-বিক্রয় করিলে সে তৎক্ষণাৎ পতিত হয়; ব্রহ্মতেজঃ তাহাকে ছাড়িয়া একেবারে অন্তর্হিত হয়। আমি অন্নাভাবে ক্লিষ্ট হইলে যাহারা আমাকে দধিদুগ্ধের সাহায্যে প্রাণ দান করে, কোন্ প্রাণে আমি তাহাদিগকে কসাইয়ের হাতে পড়িবার সুবিধা করিয়া দিব?

ব্রাহ্মণের যেমন গো-বিক্রয় নিষিদ্ধ, সেইরূপ তাহার দুগ্ধাদিও বিক্রয় করিতে নাই। দুগ্ধ বিক্রয় করিতে হইলে, বৎসকে বঞ্চিত করিয়া অধিক দুগ্ধ দোহন করিবার স্পৃহা হয়। বৎস নিজের মায়ের দুগ্ধলাভে বঞ্চিত হইতে লাগিল, কিন্তু

আমি তাহার নীতিশাস্ত্রানুগত অবশ্যপ্রাপ্তব্য দুগ্ধ কাড়িয়া লইয়া আপনার ভোগে ব্যয়িত করিতে লাগিলাম। এ কি ব্রাহ্মণের কাজ? আমার গোবৎসগুলি উদর পূরিয়া দুগ্ধ পান করিলে, পীতাবশিষ্ট দুগ্ধ আমি দোহন করিয়া লই; এবং তাহাতেই আমাদের উভয়ের প্রাণরক্ষা হয় ও ব্রাহ্মণত্ব বজায় থাকে।"

অতিথি এই বাক্যে বিস্ময়ান্বিত হইয়া, কি যে উত্তর দিবেন, তাহা স্থির করিতে পারিলেন না; কেবল নিঃস্পন্দ হইয়া ব্রাহ্মণের প্রতি প্রীতি-প্রফুল্ল লোচনদ্বয় নিক্ষেপ করিয়া রহিলেন। শেষে বলিতে লাগিলেন, "মহাশয়, আমরা আমাদের পূর্ব্বপুরুষ ঋষিদিগের বহু কথা শুনিয়াছি। আপনি যে কলিযুগে সেই ঋষিবংশ অটুট রাখিয়াছেন, তাহা আগে জানিতে পারি নাই। শুনিয়াছি, ঋষিরা নিজেরা না খাইয়া অতিথিদিগকে খাওয়াইতেন; এক্ষণে প্রত্যক্ষ তাহা দেখিতে পাইয়া ধন্য হইলাম। কে বলে, ঋষিদিগকে আর দেখিতে পাওয়া যায় না? আপনার এ গ্রাম নিশ্চয়ই তপোবন এবং আপনি একজন মহর্ষি। আমি আপনার দর্শনে বহু পুণ্য সঞ্চয় করিয়া লইলাম।" এই বলিয়া অতিথি বিশ্রামান্তে তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া পরম পরিতোষের সহিত বিদায় গ্রহণ করিলেন। ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীর এই অদ্ভুত চিত্র তাঁহার হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া রহিল।

দৃশ্য—দ্বাবিংশ।

শোণিত দান।

অল্প দিন গত হইল, অধ্যাপক বিজয়চন্দ্র মজুমদারের ভ্রাতৃবধূ বামনদাস মজুমদারের ধর্ম্মপত্নী সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত হন। কলিকাতার সুবিখ্যাত চিকিৎসকগণ চিকিৎসা করিতে লাগিলেন, কিন্তু বিশেষ ফলোদয় হইল না। সকলেরই মুখে নিরাশার চিহ্ন। বিজয়চন্দ্র ভ্রাতৃবধূর জন্য বড়ই কাতর হইয়া পড়িলেন। বামনদাস বাবু ও তাঁহার পুত্র, 'কখন কি ঘটে' এই ভাবনায় আহার নিদ্রা ত্যাগ করিলেন। ডাক্তারগণ একেবারেই নিরাশ হইয়া পড়িলেন। শেষে তাঁহারা একটী মাত্র নবীন ডাক্তারের উপর রোগীর ভার অর্পণ করিয়া অবসর গ্রহণ করিলেন। রাত্রি বুঝি আর কাটে না, 'কখন কি হয়, কখন কি হয়' এই চিন্তায় সমস্ত বন্ধুবান্ধব আকুল হইয়া পড়িলেন।

নবীন ডাক্তার রোগীর নাড়ী দেখিতেছে ও ঔষধ সেবন করাইতেছে। শেষে বলিয়া উঠিল, "রোগী যেরূপ দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছেন, তাহাতে ইঁহাকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে সবলদেহের কিঞ্চিৎ শোণিত ইঁহার দেহে প্রবিষ্ট করান প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।"

বামনদাসের পুত্র তখনি বলিয়া উঠিল, "ডাক্তার বাবু, যদি কিঞ্চিৎ শোণিত মায়ের দেহে প্রবিষ্ট করাইলে ইঁহাকে আপাত-মৃত্যু হইতে রক্ষা করিতে পারেন, তবে আর বিলম্ব করিতেছেন

কেন? এখানে যত লোক উপস্থিত আছেন, আমি সর্ব্বাপেক্ষা সবল ও হৃষ্টপুষ্ট, আমার শোণিত বোধ হয় সর্ব্বশোণিত অপেক্ষা ফলপ্রদ হইবে। এই নিন; আপনার যত রক্তের প্রয়োজন হইবে, আমার শিরা কাটিয়া গ্রহণ করুন। আমার দেহের সমুদয় রক্তই ত মায়ের।”

পুত্র এই কথা বলিয়া ডাক্তারের সম্মুখে হাত বাড়াইয়া দিল, এবং শোণিত লইতে যাহা কিছু বিলম্ব হইতে লাগিল তাহা অসহমান হইয়া ব্যাকুল হইতে লাগিল। এই ব্যাকুলতার অন্তরে কি স্বর্গীয় দৃশ্য!

নবীন ডাক্তার খুরধার অস্ত্র বাহির করিয়া পুত্রের শিরা কাটিয়া কর্ত্তিত অংশে পিচ্‌কারি লাগাইয়া শোণিত শোষণ করিতে লাগিল। পুত্রের মুখে কি এক অপূর্ব্ব মনোহর ভাব দৃষ্ট হইতে লাগিল! ডাক্তার ক্ষণবিলম্ব না করিয়া পুত্রের শোণিত মাতার অঙ্গে প্রবিষ্ট করাইয়া বলিল, “আজ রাত্রির জন্য আর ভয় নাই। ইনি যদি বাঁচেন, তবে এই পুত্রের গুণেই বাঁচিবেন।”

পুত্র এই অমৃতময় বাক্যে আপনার জীবনকে ধন্য মনে করিল, চক্ষে আনন্দধারা বহিতে লাগিল। শেষে যখন দেখিল, রাত্রি কাটিল, মায়ের প্রাণ দেহ ছাড়িয়া পলাইল না, তখন পুত্র গলদশ্রু হইয়া ভাবিতে লাগিল, ‘আমি কি ভাগ্যবান্! যিনি বুকের শোণিত দিয়া আমাকে পরিবর্দ্ধিত করিয়াছেন, তাঁহার কাজে আমার শোণিত লাগিয়াছে! আমার জীবনে এমন সুখের দিন আর ঘটিবে না! স্নেহময়ী জননীই ত সন্তানের সমস্তই করেন,

সন্তান মায়ের কি করিতে পারে? আমি যে একদিনের জন্যও মাকে বাঁচাইয়া রাখিবার হেতুস্বরূপ হইলাম, ইহাতে আমার সমস্ত জীবন ধন্য হইল। ভগবন্! তোমার কৃপাতেই আমার মা আজ আমার সামান্য শোণিতে জীবন পাইলেন।'

নবীন ডাক্তারের সুচিকিৎসায়, স্বামী ও পুত্রের অক্লান্ত পরিচর্য্যায়, রোগীর রোগ দিন দিন কমিতে লাগিল; পরিবারস্থ সকলের নিরাশ হৃদয়ে আবার আশার সঞ্চার হইতে লাগিল; পুত্রের মুখ আবার সমুজ্জ্বল হইতে লাগিল। শেষে যখন নবীন ডাক্তার আর বিপদ্ নাই বলিয়া ঘোষণা করিল, সেদিন পরিবারমধ্যে উৎসব পড়িয়া গেল। সকলেরই মুখে আনন্দের উৎস! পুত্রের মুখ যে কেবল আনন্দে ভরিয়া গেল, তাহা নহে; তাহার সঙ্গে নিজ জীবন ধন্য হইয়াছে এই এক স্বর্গসহজ ভাব উদিত হইয়া মুখের শোভা আর এক অপূর্ব্ব শোভায় বিমিশ্রিত করিয়া অপার্থিব ভাব ধারণ করিল। এই অন্তর্নিহিত শোভা দেবতারাই দেখিতে পান, সামান্য মানুষের চক্ষে পড়িবার নয়।

দৃশ্য—ত্রয়োবিংশ।

স্বধর্ম্মে প্রকৃত বিশ্বাস ও কয়েকটী বঙ্গীয় ললনার চিত্র।

ভাটপাড়া-নিবাসী পণ্ডিত তারাচরণ তর্করত্ন কাশীতে গমন করেন। তথায় কাশীরাজ তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে সভাপণ্ডিতরূপে বরণ করেন। তদবধি পণ্ডিত তারাচরণ তর্করত্ন কাশীবাসী হইলেন।

তিনি স্নভাষিতের রত্নাকর ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার মুখ-কমল-বিনিঃসৃত সরস্বতী যাঁহারই কর্ণকুহরে প্রবেশ করিত, তিনিই মন্ত্রমুগ্ধবৎ হইয়া থাকিতেন। তর্করত্নের যশঃসৌরভে কাশীর দিগ্‌দিগন্ত ভরিয়া গেল। কাশীরাজের রামলীলা উপলক্ষ্যে মহারাজের যে সমস্ত আত্মীয় বন্ধুবান্ধব আসিতেন, তাঁহারা স্পষ্ট-বাক্যে বলিতেন, "আমরা রামলীলা দর্শন ছল করিয়া তর্করত্নের সুভাষিত শুনিতে আসিয়া থাকি।"

পশ্চিম প্রদেশে একজন বাঙ্গালী পণ্ডিতের এত আদর দেখিয়া আমাদের কাহার না হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হয়? বিশেষতঃ তর্করত্নের ধর্ম্মপত্নী রামরঙ্গিণী ও তাঁহার পুত্রদিগের মুখ যে কিরূপ সমুজ্জ্বল হইল, তাহা কে বর্ণনা করিতে পারিবে? তাঁহারা আপনাদের জীবন ধন্য মনে করিতে লাগিলেন।

গৃহে অর্থের সচ্ছলতা হইলে ধর্ম্মপ্রাণ বাঙ্গালী ভগবানের পূজাতেই অর্থব্যয় করিতে ভালবাসে। তর্করত্ন মহাশয়ও এই জাতীয় অনুরাগে অনুরাগী হইয়া মহাসমারোহে দুর্গোৎসব করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মপত্নী রামরঙ্গিণী, যাহাতে জগন্মাতার পূজা সুসম্পন্ন হয়, অক্লান্ত পরিশ্রমে তাহা করিতে লাগিলেন। পূজা উপলক্ষ্যে বহু দানধর্ম্ম আচরিত হইতে লাগিল। এইরূপে মহা আনন্দে কয়েক বৎসর কাটিয়া গেল। কিন্তু এ আনন্দ চিরস্থায়ী হইল না।

পণ্ডিত তারাচরণ তর্করত্ন কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইলেন। তিনি চিকিৎসার্থ কনিষ্ঠ পুত্র, একটী কন্যা ও ধর্ম্মপত্নীকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতায় আসিলেন; গঙ্গাপ্রসাদ কবিরাজ তাঁহার

চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তর্করত্ন মহাশয় যখনই বুঝিতে পারিলেন, এ রোগ সারিবার নয়, তখনই তিনি কালক্ষেপ না করিয়া পুত্র কন্যা ও স্ত্রীর সহিত ৺কাশীধাম যাত্রা করিলেন। সে সময়ে রাজঘাট পর্য্যন্ত রেলপথ ছিল।

তিনি ৺কাশীধাম পৌঁছিবার জন্য এত ব্যগ্র হইলেন যে, রাত্রিতে রাজঘাটে পৌঁছিয়াই ষোড়শবর্ষবয়স্ক কনিষ্ঠ পুত্রের উপর স্ত্রী ও কন্যার ভার অর্পণ করিয়া রাত্রির আঁধারেই এক যষ্টিমাত্র অবলম্বন করিয়া গঙ্গার অভিমুখে চলিতে লাগিলেন। মা পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বাবা! আমাদের অদৃষ্টে যা হয় হউক, তুমি তোমার পিতার অনুসরণ কর এবং নৌকায় তুলিয়া দিয়া যাহাতে তিনি এই রাত্রেই কাশীতে পৌঁছিতে পারেন, তাহার উপায় করিয়া আইস।" তর্করত্ন মহাশয় সমস্ত পথে একটুও দাঁড়াইলেন না, তিনি গঙ্গা ও কাশীদর্শনার্থ ব্যগ্র হইয়া চলিতে লাগিলেন। শেষে গঙ্গার তীরে উপনীত হইয়া একখানি নৌকা ভাড়া করিয়া যেমন তাহাতে উঠিলেন, অমনি তাঁহার পরমশান্তিজ্ঞাপক "আঃ" এই বাক্যটী উচ্চারিত হইয়া তাঁহার সমস্ত দুশ্চিন্তা লাঘব করিল। শেষে পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "যাও বাবা, তোমার জননী ও ভগিনীর নিকট যাও। তাহারা নিরাশ্রয় হইয়া উৎকণ্ঠিতচিত্তে তোমার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। আমি ৺কাশীধামে যতক্ষণ না পৌঁছিতেছি, ততক্ষণ আমার মনে পূর্ণশান্তি নাই।" পিতা মাঝিকে নৌকা ছাড়িতে বলিলেন। নৌকা চলিতে লাগিল। পিতার মুখে আর আনন্দ ধরে না। 'কাশী-সংলগ্ন মা-গঙ্গার ক্রোড়ে শয়ান হইয়াছি,

আর আমার দুঃখ কিসের,' এই চিন্তায় তাঁহার মুখ এমন সুপ্রসন্ন হইল যে, তাঁহাকে কে রোগী বলিবে? সে মুখচ্ছবির সৌন্দর্য্য যাহারা নিজ ধর্ম্মে প্রকৃতবিশ্বাসে বিশ্বাসী তাহারা ভিন্ন অন্যের বুঝিবার সাধ্য নাই।

পিতা ক্রমে রজনীর তিমিরে অদৃশ্য হইলেন, পুত্র তাহার মাতা ও ভগিনীর নিকট ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিল। মাতা সেই রাত্রিতে পুত্র ও কন্যাসহ ষ্টেশনে পড়িয়া রহিলেন। তিনি অন্তরে সাতিশয় ব্যাকুল হইলেও অসামান্য ধৈর্য্য-প্রভাবে তাঁহার ব্যাকুলতা পুত্র ও কন্যাকে জানিতে দিলেন না।

পণ্ডিত তারাচরণ ৺কাশীধামস্থ নিজ বাটীতে পৌঁছিয়া একেবারেই নিশ্চিন্ত হইলেন। তাঁহার শয়নগৃহে শয্যা প্রস্তুত ছিল, তাহাতে শয়ান হইয়া, "আঃ, আজ আমার সমস্ত ভাবনা দূর হইল," বলিয়া পরম শান্তিলাভ করিলেন। প্রভাত হইবামাত্র, তাঁহার তৃতীয় পুত্র রাজঘাট ষ্টেশনে গিয়া মা ও ভাই ভগিনীকে লইয়া ঘরে ফিরিলেন। দুর্গাপূজার দিন সন্নিকট হইয়া আসিল। 'পূজা যেমন হইয়া থাকে, এবারেও সেইরূপ হইবে' এই আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া পুত্রগণ তাহাতে ব্যস্ত হইলেন। কিন্তু জননীর আর অন্য কার্য্য নাই, তিনি কেবল পীড়িত স্বামীর সম্মুখে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহার শুশ্রূষায় ব্যাপৃত রহিলেন; পূজার কোনও সংবাদ লইলেন না।

ষষ্ঠীর দিন রাত্রিতে পণ্ডিত তারাচরণ উপর হইতে নীচে নামিলেন এবং প্রতিমাকে প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিলেন, "বাঃ, আজ মায়ের কি শোভাই হইয়াছে! মায়ের এমন রূপ ত

জন্মাবচ্ছিন্নে কখনও দেখি নাই! আজ আমি মাকে দেখিয়া ধন্য হইলাম! মা আজ কি সুন্দরই সাজিয়াছেন!" এই বাক্য বলিতে বলিতে গলদশ্রুলোচনে, যে গৃহ হইতে প্রতিমা সম্পূর্ণ-ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়, সেই নিম্নতলস্থ গৃহে শয়ান হইয়া নিঃস্পন্দনয়নে প্রতিমা দেখিতে লাগিলেন। পত্নীও উপরের ঘর ছাড়িয়া স্বামীর অধ্যুষিত গৃহে আসিয়া স্বামীর শুশ্রূষা করিতে বসিলেন। প্রতিমার দিকে তাঁহার দৃষ্টি নাই, তাঁহার দৃষ্টি কেবল স্বামীর উপরেই পতিত। তাঁহার মুখ দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল, 'তাঁহার স্বামীই তাঁহার সোণার প্রতিমা। তাঁহার স্বামীই তাঁহার পরম দেবতা। তিনি ইঁহাকে ছাড়িয়া আর কোন্ প্রতিমা দেখিবেন? আর কোন্ দেবতা পূজা করিবেন?' পতিব্রতা রমণীদের কার্য্যপ্রণালী সমস্তই এক-প্রকার।

কলিকাতা হিন্দুস্কুলের ভূতপূর্ব্ব হেডমাষ্টার বাবু কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের ধর্ম্মপত্নীকে তাঁহার গৃহে উপস্থিত কোনও নারী জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "হ্যাঁ গো দিদি, তোমার ত এখন বয়স হইয়াছে, তোমার নাতি পুতি হইয়াছে, অর্থেরও ভাবনা নাই, তুমি তীর্থ দর্শন করিতে যাওনা কেন? কালীঘাট ত এত নিকট, মা কালী-দর্শন করিতে যাও না কেন?" প্রত্যুত্তরে তিনি অঙ্গুলি দ্বারা স্বামীর শ্রীচরণখানি দেখাইয়া বলিলেন, "বোন্, আমার ধর্ম্মকর্ম্ম তীর্থ-দর্শন সমস্তই ঐ শ্রীচরণ। বোন্, ভগবানের নিকট প্রার্থনা কর, যেন ঐ চরণ-সেবান্তে ঐ চরণদর্শন আমার শেষ তীর্থদর্শন হয়। আমার আর অন্য দেবতা নাই, আমার আর অন্য ব্রত নাই, আমার আর অন্য তীর্থ নাই।"

৺কাশীধামে পণ্ডিত তারাচরণ তর্করত্নের গৃহে তিন দিন যথাবিধি পূজা সম্পন্ন হইল। তর্করত্ন মহাশয় শয্যায় শয়ন করিয়া নয়ন ভরিয়া প্রতিমা দর্শন, প্রণাম ও অশেষ তৃপ্তি লাভ করিলেন। পত্নী সম্মুখে সমভাবেই উপবিষ্টা হইয়া ঘড়ি ধরিয়া ঔষধ সেবন করাইতে লাগিলেন এবং পথ্যদান ও সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। পূজা কোন্ দিক্ দিয়া কাটিয়া গেল, তাহা তিনি জানিতেই পারিলেন না। তিনি কেবল নিরাশ নয়নে স্বামীর দিকে চাহিয়াই আছেন ও স্বামীর যাহাই প্রয়োজন হইতেছে তাহাই সম্পন্ন করিতেছেন। দ্বাদশী কাটিয়া গেল, স্বামী সংজ্ঞাহীন হইলেন; তখন তাঁহার সেবা করিবার আর কিছুই রহিল না দেখিয়া, পত্নী নিকটে একটী আসনে উপবিষ্ট হইয়া স্বামীর শ্রীমুখ পানে তাকাইয়া রহিলেন; স্বামীর আহার বন্ধ হইল, তাঁহারও স্নানাহার বন্ধ হইল।

স্বামীর নিঃসংজ্ঞাবস্থায় দেড় দিন কাটিয়া গিয়া যখন শ্বাস উপস্থিত হইল, তখন পত্নী পুত্রদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বাবারা, এক্ষণে তোমরা পুত্রের কর্ত্তব্য কাজ কর। ইঁহার চিরদিন সাধ ছিল ৺কাশীধামে মরিব, তাহা পূর্ণ হইতেছে। তোমরা ইঁহাকে শিবের সাজে সাজাও। বিভূতি ও রুদ্রাক্ষের মালা আনিয়া দেও, আমি স্বয়ং সাজাইয়া দিব।" এই বলিয়া তিনি নিজ হস্তে স্বামীকে অভীপ্সিত সজ্জায় সুসজ্জিত করিয়া, গলবস্ত্রে প্রাণ ভরিয়া একটী বহুক্ষণব্যাপী প্রণাম করিলেন ও সেই স্থান ত্যাগ করিলেন। তাঁহার চক্ষে এক বিন্দুও জল নাই। পুত্রেরা শিব-নাম করিতে করিতে পিতাকে চিরদিনের জন্য

ঘরের বাহির করিলেন এবং যথাকালে শেষকৃত্য সুসম্পাদিত করিলেন।

পুত্রেরা গৃহে ফিরিয়া আসিয়া, "বাবা, আজ যে আমাদের গৃহ গৃহদেবতাশূন্য হইল! দেবতাহীন দেবগৃহ যে একেবারে অন্ধকারাবৃত হইল! আমরা দেবতাশূন্য এই গৃহে কি সাহসে থাকিব?" এই বলিয়া ক্রন্দনধ্বনিতে আকাশ পাতাল ফাটাইতে লাগিলেন, কিন্তু মাতা রামরঙ্গিণীর চক্ষে এক বিন্দুও জল নাই। তিনি কেবল স্বামীর পারলৌকিক-কার্য্য শ্রাদ্ধাদি সম্পাদনে যাহাতে কোনও রূপ বৈগুণ্য না ঘটে, সেই চিন্তাতেই নিমগ্না। 'বঙ্গমাতার বিদ্বন্মণিহারের মধ্যমণি আমার স্বামী। তাঁহার পারলৌকিক কার্য্যে কোনও দোষ ঘটিলে দুঃখের আর অবধি থাকিবে না,' এই ধারণায় তিনি শোক কাহাকে বলে তাহার চিহ্ন পর্য্যন্ত প্রকাশ করিলেন না। স্বামীর নামের অনুরূপ শ্রাদ্ধাদি সুসম্পন্ন হইল। বিধবা পত্নী এক্ষণে শোক করিবার অবসর পাইয়া শয্যা গ্রহণ করিলেন। তাঁহার সোণার কান্তি একেবারে লোহার রঙে পরিণত হইল। দেহ দিন দিন শুষ্ক হইতে লাগিল। জ্বর নাই, গায়ে উত্তাপ নাই, কেবল অন্তস্তাপেই শরীর ক্ষয় হইতে লাগিল।

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারীর পৌত্রীর স্বামিরত্ন-বিসর্জ্জনান্তে ঠিক এই অবস্থা হইয়াছিল। তাঁহার চক্ষে এক বিন্দুও জল দেখা যায় নাই। কিন্তু তত বড় স্থূল দেহ এক মাসের মধ্যেই শুকাইয়া কঙ্কালসার হইয়া গেল। তাঁহার খুল্লতাত চিকিৎসকরাজ সুরেশ প্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এম্ ডি তাঁহার চিকিৎসা করিতে গিয়া কোনও বাহ্য রোগ দেখিতে না

পাইয়া বলিয়াছিলেন, "বড় দাদার এই মেয়ের রোগ কৈ, যে চিকিৎসা করিব? ইহার বাহিরে কোনও রোগ নাই, কেবল অন্তর্দাহ ইহার দেহ খাক করিতেছে। ইহার চিকিৎসা সেই দিন হইবে, যে দিন এ পরলোকে স্বর্গত স্বামীর পার্শ্বে দাঁড়াইবে। তিনিই ইহার স্বর্বৈদ্য, তিনি ভিন্ন ইহার আর অন্য বৈদ্য নাই!!"

বহু বৎসর গত হইল কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের একটী ছাত্রের ভগিনীরও এই দশা ঘটিয়াছিল। রূপে কন্দর্পের সমান, গুণে শিবতুল্য, বিদ্যা-বুদ্ধিতে বৃহস্পতি-সম স্বামীকে মৃত্যুশয্যায় শয়ান দেখিয়া উক্ত ছাত্রের ভগিনী এক বিন্দুও অশ্রুমোচন করিলেন না। তিনি সত্বর কপাল ভরিয়া সিন্দূর মাখিলেন ও পান গালে করিয়া প্রাণহীন স্বামীর পার্শ্বে আসিয়া শয়ন করিলেন ও শেষে সমুপাগত সমস্ত আত্মীয়বর্গ-সমীপে অনুনয় বিনয়ের সহিত সহমরণার্থ সহায়তা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। বাহুদ্বয়ে স্বামীর গলদেশ এমন দৃঢ়ভাবে ধরিয়া রহিলেন যে, অশ্রুবর্ষী আত্মীয়বর্গ কিছুতেই তাঁহার হস্ত স্বামীর গলদেশ হইতে বিমুক্ত করিতে পারিল না। শেষে যখন বুঝাইয়া দেওয়া হইল, "ইংরাজ-রাজ সহমরণ-প্রথা উঠাইয়া দিয়াছেন, যাহারা সহমরণের সহায়তা করিবে, তাহাদিগকে তীক্ষ্ণ দণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইবে," তখন তিনি স্বামীকে ছাড়িয়া একটী নির্জন গৃহে গিয়া বসিলেন। তাঁহার অপ্সরাবিনিন্দিত রূপ অন্তর্লীন হইয়া গেল। অল্পদিন-মধ্যে সমস্ত দেহ শুকাইয়া কঙ্কালাবশিষ্ট হইল। সোণার পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া গেল, স্বর্গত-পতিদর্শন-সমুৎসুক প্রাণ-পাখী স্বর্গে উড়িয়া গেল।

পণ্ডিত তারাচরণ তর্করত্নের বিধবা পত্নীর দেহ অন্তস্তাপে জর্জ্জরীভূত হইয়া শেষ দশায় উপনীত হইল। জীবনের শেষ দিন আসিয়া উপস্থিত হইল। সে দিন তিনি বুঝিতে পারিলেন, আজ আমি পরলোকগত স্বামীর নিকট যাইব। তিনি স্বয়ং শয্যা পাতিলেন ও একপার্শ্বে ষোড়শ-বর্ষ-বয়স্ক কনিষ্ঠ পুত্রকে ও অপর পার্শ্বে কন্যাকে শায়িত করিয়া নিজে মধ্যস্থলে শয়ন করিলেন ও দুইখানি হাত দুই সন্তানের উপরে রাখিয়া কিসের জন্য যেন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। হঠাৎ তাঁহার কালিমা-মাখা মুখখানি উজ্জ্বলমূর্ত্তি ধারণ করিল। এত দিনের পর তাঁহার মুখে হাসি দেখা দিল। তিনি হাসিতে হাসিতে আনন্দ-বিস্ফারিত লোচনে কি যেন দেখিতে লাগিলেন! বোধ হইতে লাগিল, তাঁহার স্বামী যেন স্বর্গ হইতে নামিয়া তাঁহাকে লইয়া যাইতে আসিয়াছেন। এই আনন্দে তাঁহার নেত্র স্থির হইল। তাঁহার জীবাত্মা মর্ত্ত্যধাম ছাড়িয়া স্বর্গত স্বামীর অনুসরণ করিল; স্বর্গের হাসিটুকু মুখে লাগিয়া রহিল। পুত্রগণ নিশ্চল নেত্রে মায়ের এই স্বর্গীয় হাসি দেখিতে লাগিলেন। তাঁহারা কাঁদিবেন কি, সকলেই নিঃস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া, স্বর্গের চিত্র কি বিচিত্র, তাহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া নির্ব্বাক্ হইয়া রহিলেন।

দৃশ্য—চতুর্ব্বিংশ।

একাধারে কয়েকটী সুদৃশ্য।

স্যার্ আশুতোষ বাল্যকালে এন্ট্রান্স্ পরীক্ষায় উচ্চস্থান লাভ করিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রবিষ্ট হইলেন। তিনি অসাধারণ বুদ্ধি ও স্মরণশক্তিতে সমস্ত অধ্যাপকদিগের নয়ন-রঞ্জন হইলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার কৃতকার্য্যতা বিষয়ে কেহই বিস্ময়াপন্ন হইলেন না। যখন তিনি এম্. এ, ক্লাসে পড়েন, তখন রায় বাহাদুর বিপিনবিহারী গুপ্ত, কিছু দিনের জন্য তাঁহার অধ্যাপনা-কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন। তিনি স্পষ্টই বলিতেন, "গণিতে আশুতোষ বেশী জানে, কি আমি বেশী জানি, তাহা নির্ণয় করিতে পারি নাই। আমার মনে হয়, সে অনুগ্রহ করিয়া আমার নিকট পড়িতেছে।"

এম্, এ, পরীক্ষান্তে স্যার্ আশুতোষ এম্. এ, পরীক্ষায় পরীক্ষক নিযুক্ত হইলেন। তখন এম্ এ, পরীক্ষা দিয়া কেহই এন্ট্রান্স্ পরীক্ষায় পরীক্ষক হইবার আশা করিতে পারিতেন না। সংস্কৃত ভিন্ন আর সমস্ত বিষয়ে ইংরাজ অধ্যাপকগণই পরীক্ষক নিযুক্ত হইতেন। কিন্তু একজন অল্পবয়স্ক বাঙ্গালী ছাত্র এম্, এ, পরীক্ষান্তে এম্, এ, পরীক্ষায় পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়াছে, ইহা যাঁহারই কর্ণে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল, তিনিই বিস্ময়োৎফুল্ল-লোচনে বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিভাবকদিগকে গুণের পক্ষপাতিত্ব জন্য প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। যে দিন এম্, এ, পরীক্ষা সম্বন্ধে পরীক্ষকদিগের সমিতি হইল, সেই দিন প্রবীণ

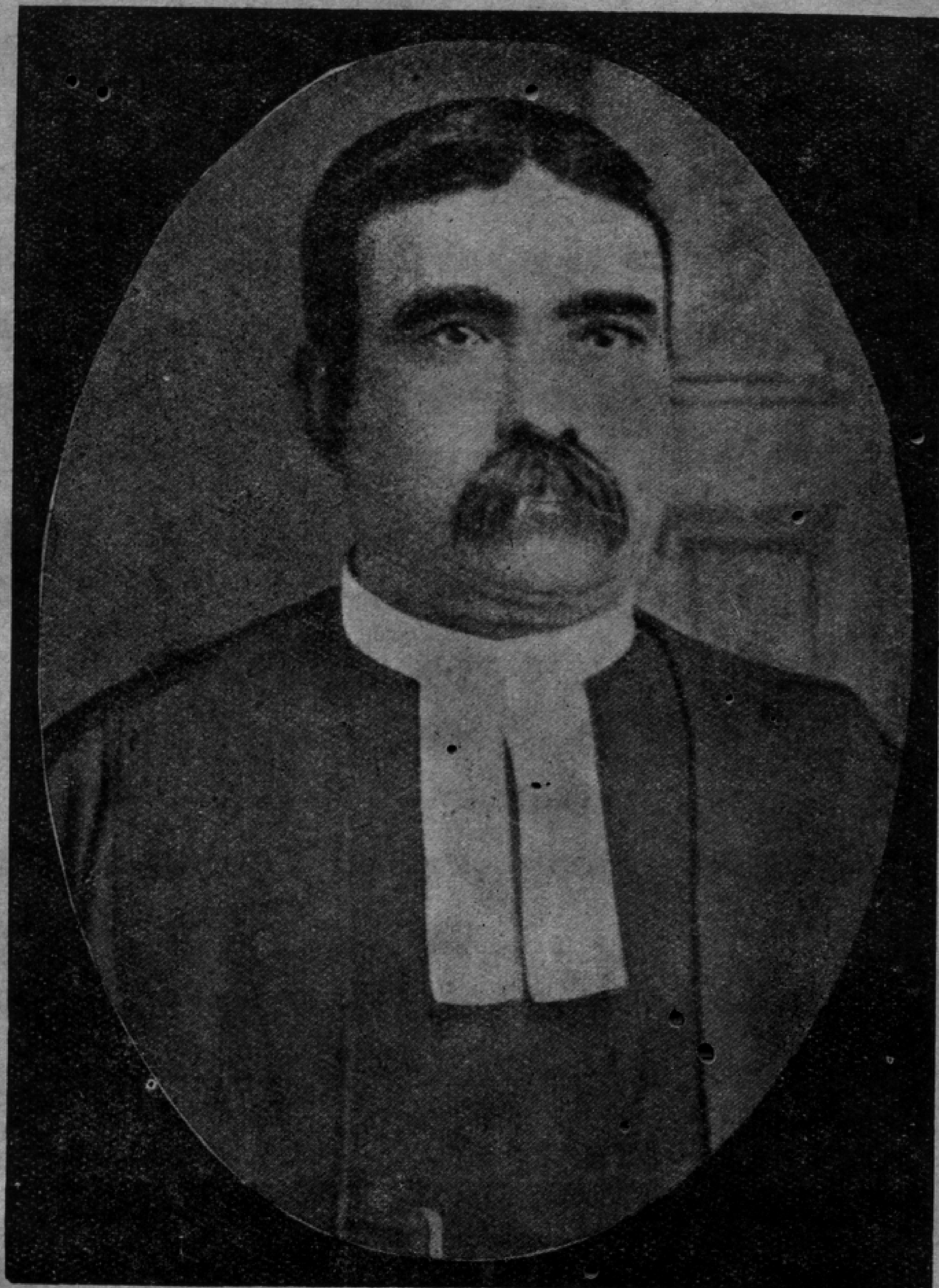

মাননীয় স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

পরীক্ষকদিগের মধ্যে একটী বালক বসিয়া সমিতির কি যে শোভা বিস্তার করিয়াছিল, তাহা যিনিই দেখিয়াছিলেন, তিনিই তাঁহার নিশ্চল নেত্র ঐ বালকের মুখ হইতে অপসারিত করিতে পারেন নাই। এই অপরূপ দৃশ্যে তাঁহারা মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন।

২। ক্রমে স্যার্ আশুতোষ সিণ্ডিকেটের সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন। তখনও তাঁহার বি, এল্ পরীক্ষা ও তৎপরে ডি, এল্, পরীক্ষা দেওয়া হয় নাই। তিনি সিণ্ডিকেটে সদস্য হওয়াতে বি, এল্, ও ডি, এল্, পরীক্ষার্থ যে সকল পরীক্ষক নিযুক্ত করেন, তাঁহাদেরই নিকট অন্যান্য ছাত্রের ন্যায় টুল ও ছোট টেবিল লইয়া যখন পরীক্ষা দিতে বসিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিভাবক হইয়া সামান্য ছাত্র সাজিয়া ছাত্রদিগের আসন হইতে নিজের আসন অন্যবিধ করিলেন না, তখন তাঁহার এক অদ্ভুত শোভা বিকাশ পাইয়াছিল। যিনিই এই দৃশ্য দেখিয়াছিলেন, তিনি তদ্গতচিত্ত না হইয়া থাকিতে পারেন নাই। এই অভিমান-শূন্যতার মধ্যে স্বর্গীয় দৃশ্য প্রতিভাত হইয়াছিল।

৩। সিণ্ডিকেটের সদস্য হইয়া স্যার্ আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে এত সংবাদ রাখিতেন যে, কেহই তাঁহাকে কোনও বিষয়ে নিরুত্তর করিতে পারিতেন না। বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার জন্য অনেক সময়ে অনেক শ্বেতাঙ্গকে হার মানিতে হইত। কালা বাঙ্গালীর নিকট হার মানা তাঁহাদের এত অসহ্য হইয়াছিল যে, এমন কি, গুণ-পক্ষপাতী স্যার্ আলফ্রেড্ ক্রফট্ ও আর কয়েকটী শ্বেতাঙ্গ স্যার্ আশুতোষকে সিণ্ডিকেট্ হইতে অপসৃত করিবার জন্য দলবদ্ধ হন; কিন্তু তাঁহারা কৃতকার্য্য

হইতে পারেন নাই। একটী বাঙ্গালী সদস্য আমাদের নিকট বর্ণন করেন, "যখন স্যার্ আশুতোষের অভিজ্ঞতা ও তর্কের নিকট পরাজিত হইয়া শ্বেতাঙ্গগণ অপ্রস্তুত হইয়া নিজ নিজ আসনে ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়েন, তখন আমরা আশুতোষকে যে কি সুন্দর দৃশ্য মনে করি, তাহা বর্ণনা করিয়া বুঝাইতে পারি না।"

৪। কার্য্য-নিষ্ঠতা ও কার্য্য-তৎপরতা বিষয়ে স্যার্ আশুতোষ অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়া বসিয়া আছেন। আজ দুইশত বিষয় সমাধান করিতে হইবে, সময় দেড় ঘণ্টা মাত্র। তাঁহার কি সুব্যবস্থা! যে সময়ে যে কাজ করিতে প্রতিশ্রুত হন, সেই সময়ে সেই কাজ করিবেনই করিবেন। অনেক সময়ে দৈবও তাঁহার কার্য্যে বাধা দিতে পারেন না। সে দিন জলপ্লাবনে কলিকাতা ভাসিয়া গেল। পথে এক-বুক জল। স্কুল কলেজ আপিস এক প্রকার বন্ধ হইয়া গেল। স্যার্ আশুতোষ নির্দ্দিষ্ট সময়ে সেনেট্ হলের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে প্রভূত জল ঠেলিয়া আসিতে আসিতে তাঁহার মোটর গাড়ী অচল হইয়া গেল, তখন তিনি আর কোনও গাড়ী না পাইয়া একখানি রিক্‌শ পাইলেন। মোটর ছাড়িয়া তিনি সেই রিক্‌শতে উঠিলেন। রিক্‌শতে যাতায়াত করিতে আজিও সাধারণ লোকে লজ্জিত হয়, কিন্তু স্যার্ আশুতোষ কাজ চান, অভিমান্ চান না। তখন তিনি হাইকোর্টের চিফ্ জষ্টিস্। স্যার্ আশুতোষ যখন রিক্‌শ করিয়া প্রভূত জলরাশি মধ্য দিয়া আসিতে লাগিলেন, তখন কি মনোরম দৃশ্যই দেখা গেল! মুখে মৃদু হাস্য, লোকের উপহাসে উদাসীনতা যিনিই প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তিনিই এই চিত্রে মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

৫। স্যাড্‌লার কমিশনে নিযুক্ত হইয়া যখন তিনি স্কুল কলেজ পরিদর্শনার্থ ভারতবর্ষের নানা স্থানে পরিভ্রমণ করেন, তখন তিনি বহু স্থানে কি যে সুদৃশ্য বস্তু হইয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে একটীমাত্র ঘটনা বর্ণিত হইতেছে।

একদিন মাননীয় স্যাড্‌লার প্রভৃতি ইংরাজ মহোদয়গণ ও স্যার্ আশুতোষ রেলযোগে একস্থানে যাইতেছিলেন। পথে এক ষ্টেশনে লোকে লোকারণ্য, অথচ কেহই গাড়ীতে উঠিতেছে না দেখিয়া স্যার্ আশুতোষ কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া নিকটস্থ এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানে এত লোক সমবেত কেন?" সেই লোকটী স্যার্ আশুতোষকে চিনিতেন না। তিনি বিরক্ত-ভাবে বলিলেন, "আপনি বুঝি আজকাল কোনই খবর রাখেন না? আপনি কি জানেন না, আজ এই গাড়ীতে স্যার্ আশুতোষ এই পথ দিয়া যাইবেন? ষ্টেশনে যে কয় মিনিট্ গাড়ী থামে, সেই সময়ে এই সকল ব্যক্তি তাঁহার অভ্যর্থনা করিবে। দেখিতে পাইতেছেন না, কত লোকে ফুলের মালা লইয়া দাঁড়াইয়া আছেন?"

তিনি এই কথা শেষ না করিতে করিতে একটী বালক নিকটে আসিয়া বলিল, "এই যে স্যার্ আশুতোষ এই কামরায় বসিয়া আছেন।"

অপরিচিত বালকের মুখে এই কথা শুনিয়া স্যার্ আশুতোষের কৌতূহল জন্মিল। তিনি বালককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "ভাই, তুমি কি করিয়া জানিলে যে আমিই আশুতোষ?" বালক বলিল, "আমরা আপনার ফটো ঘরে ঘরে রাখিয়াছি।

আমরা প্রতিদিন আপনার ফটো পূজা করি। আপনার ফটো বিশেষ পরিচিত থাকাতে আপনি লুকাইয়া বসিয়া থাকিলেও আমরা ধরিয়া ফেলিয়াছি।” বালকটী এই কথা বলিয়া চীৎকার করিয়া সকলকে সংবাদ দিবামাত্র সকলে ঊর্দ্ধশ্বাসে স্যার্ আশুতোষের অভিমুখে ধাবিত হইল। অভ্যর্থনার্থ তাহাদের ব্যগ্রতা দেখিয়া স্যার্ আশুতোষকে সেই ষ্টেশন প্লাটফরমে নামিয়া দাঁড়াইতে হইল। সকলে আসিয়া তাঁহার গলদেশে ফুলের মালা পরাইতে লাগিল। স্যার্ আশুতোষ স্মিতহাস্যে সুপ্রসন্ন-বদনে অবনত-মস্তকে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাদের পুষ্পমালা সাদরে গ্রহণ করিতে লাগিলেন। কি সুদৃশ্য! গুণের আদরের মধ্যে স্বর্গীয় ভাব থাকাতে, এই দৃশ্য সমস্ত দ্রষ্টব্য পদার্থকে পরাজিত করিল।

দৃশ্য—পঞ্চবিংশ।

জ্যেষ্ঠানুরাগ।

এক দিন ডাক্তার স্যার্ নীলরতন সরকারের নিকট বসিয়া আছি, নিকটে আর জনমানব নাই; হঠাৎ তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অবিনাশচন্দ্র অন্দর হইতে আসিয়া নীলরতনকে সম্বোধন করিয়া বলিল, “নীলু, তুই কি আমায় ডাক্‌ছিস্?” নীলরতন চমকিত হইয়া বলিল, “কৈ দাদা, আমি ত ডাকি নাই!” যখন নীলরতন জ্যেষ্ঠের মুখে শুনিল, “আমি ডাকিয়াছি,” তখন তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া দেখি, তাহার উজ্জ্বল-সম্মিত চক্ষু লজ্জায়

মাননীয় স্যার নীলরতন সরকার।

ঔজ্জ্বল্যহীন ও সঙ্কুচিত হইয়া বিপরীত ভাব ধারণ করিয়াছে। অপরাধী আত্মা যেন নয়নদ্বয়ে প্রতিফলিত হইয়া, মুকুরে স্থিত প্রতিবিম্বের ন্যায় প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। আমি যতই তাহার চক্ষুর দিকে তাকাইতে লাগিলাম, ততই তাহার চক্ষু যেন বলিতে লাগিল, "কি লজ্জার কথা! আমি বড় ভাইকে ডাকিতে পাঠাইয়াছি! ছোট হ'য়ে বড় ভাইকে ডাকিতে পাঠান ত কম আস্পর্দ্ধার কথা নয়! আমি যে এত অধঃপাতে গিয়াছি, দাদাই বা ইহা বিশ্বাস করিলেন কেন? জ্যেষ্ঠভ্রাতা ত পিতৃতুল্য। এই জন্য ময়মন্‌সিঙ্‌ অঞ্চলে কনিষ্ঠগণ জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতাকে ঠাকুরদাদা বলিয়া ডাকে। আমি সেই পিতৃস্থানীয় জ্যেষ্ঠকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছি! বোধ হয় জ্যেষ্ঠের প্রতি কনিষ্ঠের যেরূপ গৌরব থাকা উচিত, তাহার ত্রুটি হইয়াছে।"

নীলরতনের সেই চক্ষুর্দ্বয় আজিও আমার মানসপট হইতে অপসৃত হইতেছে না। জ্যেষ্ঠের প্রতি তাহার কি গৌরব, কি অনুরাগ! দাদার একটী মাত্র পুত্র, তাহাকে সর্ব্বোচ্চ শিক্ষা দিতে হইবে, এই বলিয়া ভ্রাতৃতনয়ের শিক্ষা সম্পূর্ণ করিবার জন্য তাহাকে বিলাতে পাঠাইয়া সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিল। দাদার বহুমূত্রের পীড়া হইয়াছে, এই পীড়ায় দার্জ্জিলিঙ্গে অবস্থান উপকারক, ভাবিয়া তথায় একখানি সুন্দর বাটী ক্রয় করিয়া, জ্যেষ্ঠের বাসার্থ সুব্যবস্থা করিয়া দিল। নীলরতনের পিতামাতা জীবিত না থাকাতে, তাঁহাদের প্রতি যে অনুরাগ তাহা জ্যেষ্ঠের উপরেই ঢালিয়া দিয়াছিল। আমি যখনই তাহার এই গুণ চিন্তা করি, তখনই তাহার হাসি হাসি মুখখানিতে কিছু অসাধারণত্ব

দেখিতে পাই ; সম্পূর্ণ স্বর্গীয়ভাব দেখিতে পাইয়া অপার আনন্দ অনুভব করি। নীলরতন কিছুদিন আমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেও আমি জ্যেষ্ঠানুরাগ-বিষয়ে তাহার শিষ্য হইয়া পড়িয়াছি। তাহাকে স্যার্ বলিতে আনন্দ পাইয়া থাকি।

দৃশ্য—ষড়্বিংশ।

চরিত্রবানের নির্ভীকতা ও বিপৎকালে ধৈর্য্য।

জয়পুরের মহারাজ অত্যন্ত বাঙ্গালী-ভক্ত ছিলেন। বাঙ্গালীর কার্য্যনিপুণতা, বাঙ্গালীর চরিত্র, বাঙ্গালীর নির্লোভতা তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিল। সেই জন্য বাঙ্গালীর নামে তিনি গলিয়া যাইতেন। বাবু কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় একজন সামান্য শিক্ষকরূপে রাজসংসারে প্রবেশ করেন। তিনি কার্য্যদক্ষতায় মহারাজের সুনয়নে পড়িলেন। মহারাজ যতই তাঁহার কার্য্যকলাপ দেখিতে লাগিলেন, ততই আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন। শেষে তাঁহাকে প্রধান মন্ত্রীর কার্য্যে নিযুক্ত করিতে দ্বিধা বোধ করিলেন না। কলিকাতার সেনবংশীয়গণও রাজার বড়ই প্রিয়পাত্র ছিলেন। এই সময়ে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক পণ্ডিত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীনাথ ভট্টাচার্য্য কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের এম্, বি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া জয়পুর-রাজবাটীতে চিকিৎসক নিযুক্ত হইলেন। চিকিৎসা-নৈপুণ্যে তাঁহার এমন সুযশঃ বাহির হইল যে, রাজসংসারে নিযুক্ত ইংরাজ ডাক্তার অপেক্ষা তাঁহার আদর অধিক হইতে লাগিল। প্রধান মন্ত্রী

কান্তি বাবুর বাটীর পরিবারবর্গ চিকিৎসা বিষয়ে শ্রীনাথকেই অধিক পছন্দ করিতেন।

একদিন প্রধান মন্ত্রী কান্তিচন্দ্র ও ডাক্তার শ্রীনাথ এই উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্য ঘটিল। ডাক্তার শ্রীনাথ, কান্তিচন্দ্রের বাটীতে চিকিৎসা বন্ধ করিলেন। তিনি চিকিৎসা বন্ধ করাতে, কান্তিচন্দ্রের পরিবারমধ্যে মহা অশান্তি উপস্থিত হইল। কান্তি-চন্দ্র নিরুপায় হইয়া মহারাজকে জানাইলেন, মহারাজ ডাক্তার শ্রীনাথকে কান্তিচন্দ্রের বাটীতে চিকিৎসা করিতে অনুরোধ করিলেন। শ্রীনাথ কান্তিবাবুর বাটী গিয়া রোগীর রোগ পরীক্ষা ও ঔষধাদির ব্যবস্থা করিলেন, কিন্তু বাটীর কর্ত্তার দিকে তাকাই-লেন না। কান্তিবাবু শ্রীনাথকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "শ্রীনাথবাবু, আপনি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন 'আমার বাটীতে পদার্পণ করিবেন না,' সে প্রতিজ্ঞা কোথায় রহিল ?"

শ্রীনাথ অতিশয় চরিত্রবান্ ছিলেন। তাঁহার নিষ্কলঙ্ক চরিত্রে কেহ কখন কোনও খুঁত বাহির করিতে পারে নাই। মহারাজও তাঁহার নিষ্কলঙ্ক চরিত্র সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ পাইয়া তাঁহাকে 'জিতেন্দ্রিয়' এই আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। যে ব্যক্তি চরিত্রবলে বলীয়ান্, সে স্বভাবতঃই নির্ভীক হয়। সুতরাং ডাক্তার শ্রীনাথ কান্তিবাবুর এই বাক্যে অকুতোভয়ে বলিলেন, "কান্তি বাবু! আপনার বাটীতে শ্রীনাথ আসে নাই, ডাক্তার নামে অভিহিত শ্রীনাথের যে অপর মূর্ত্তি আছে, সেই আসিয়াছে। একটী দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছিন্ন বস্ত্র পরিয়া প্রতিদিন গঙ্গাস্নানে যাইতেন। তিনি গঙ্গাস্নান করিয়া যখন গৃহে প্রতিনিবৃত্ত

হইতেন, তখন পথে কেহই তাঁহাকে গণনাই করিত না। একদিন উক্ত দরিদ্র ব্রাহ্মণ একখানি তসর কাপড় পাইয়া গঙ্গাস্নানান্তে তাহা পরিধান করিয়া যখন গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হন, তখন পথের সমস্ত লোক, তাঁহাকে প্রণাম করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণও তসর কাপড়ের কোঁচাটী নাড়িতে নাড়িতে চলিতে লাগিলেন। এক ব্যক্তি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'ভট্টাচার্য্য মহাশয়! আপনি দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া কোথায় আশীর্ব্বাদ করিবেন, তাহা না করিয়া কোঁচা নাড়িতেছেন কেন?' ব্রাহ্মণ বলিলেন, 'লোকে আমাকে ত প্রণাম করিতেছে না? উহারা আমার তসর কাপড়কে প্রণাম করিতেছে। আমাকে যদি প্রণাম করিত, তাহা হইলে অন্যদিন আমি ছিন্নবস্ত্রপরিহিত থাকিলেও আমাকে প্রণাম করিত। উহারা তসর বস্ত্রকে প্রণাম করাতে আমার তসরের কোঁচা উহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতেছে।' ঐ ক্ষেত্রে লোকে যেমন তসর কাপড়কে প্রণাম করিতেছে, ব্রাহ্মণকে প্রণাম করে নাই, সেইরূপ আপনি ডাক্তারকে আনিবার জন্য রাজা দ্বারা অনুরোধ করাইয়াছেন, শ্রীনাথকে আনিবার জন্য অনুরোধ করাইতে পারেন নাই। ডাক্তার রাজার ভৃত্য, শ্রীনাথ রাজার ভৃত্য নহে। আজ যদি আমি ডাক্তারি ত্যাগ করি, আপনি কি আমাকে রাজার ভৃত্য বলিতে পারিবেন? রাজার ডাক্তার রাজার কথা শুনিতে বাধ্য। রাজা যদি একটা কুকুরকে চিকিৎসা করিতে বলেন, তাঁহার ভৃত্য ডাক্তার তাহা কি করিবে না? কিন্তু শ্রীনাথ তাহা কিছুতেই করিবে না।"

এই বাক্যে কান্তিচন্দ্রের মুখ ক্রোধে রক্তিম-বর্ণ হইল। তাঁহার দেহ কাঁপিতে লাগিল, তিনি রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী। জয়পুর রাজ্যের প্রজাগণ স্পষ্ট ভাষাতেই বলিত, রাজা ত কান্তিচন্দ্র। এরূপ ক্ষমতাপন্ন হইয়াও তিনি তৎক্ষণাৎ আত্ম-সংযম করিলেন। তাঁহার মুখের রক্তিমবর্ণ তিরোহিত হইল। তিনি একটু মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন, "শ্রীনাথবাবু, আপনি আমার প্রতি আজ বড়ই কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করিলেন। কিন্তু আমি সহ্য করিলাম। তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—

দুরন্ত বরিষাকাল
হরিণ চাটে বাঘের গাল।
আরে হরিণ তোরে কই
সময়-গুণে সকল সই॥

এই শ্লোকটী তিনি যতই মনে মনে আবৃত্তি করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার মুখে কোমলতা আবির্ভূত হইয়া অপূর্ব্ব শ্রীবিধান করিল। সমুপাগত কতকগুলি লোক বলিয়া উঠিল, "কান্তিবাবুর কি ধৈর্য্য, কি ক্ষমা! এমন না হইলে কি এত বড় একটা রাজ্যের ভার ভগবান্ উঁহার হাতে দিতেন? দেখ দেখ, বদনের ক্রোধ লৌহিত্য লুকাইয়া কি সৌন্দর্য্য বিধান করিতেছে!!" আবার অপর কতকগুলি লোক শ্রীনাথের নির্ভীকতা দেখিয়া বলিতে লাগিল, "উঃ! শ্রীনাথ বাবুর কি নির্ভীকতা!" যাহার চরিত্রে কোনও গলদ নাই, সে কাহাকেই বা ভয় করিবে? একদিন রাজপুরীতে রাজার এক অপ্সরোপমা বাইজী রূপগর্ব্বে অন্ধ হইয়া শ্রীনাথ বাবুর এত নিকট দিয়া চলিয়া গিয়াছিল যে, তাঁহার গায়ে

বাইজীর অঙ্গ স্পর্শ হইবার সম্ভাবনা হইয়াছিল। এই অপরাধে শ্রীনাথবাবু রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন, "মহারাজ! আমি আপনার চাকরি করিব না। আমি দেশে চলিলাম। রূপ-গর্ব্বিতা বাইজীর এত বড় আস্পর্দ্ধা যে আমার অতি সন্নিকট স্থান দিয়া অসঙ্কুচিত ভাবে চলিয়া যায়!!" এইবাক্য শুনিয়া মহারাজ শ্রীনাথ বাবুর চরিত্রে সন্তুষ্ট হইয়া বাইজীকে ধমকাইয়া দিয়াছিলেন। যে শ্রীনাথ চরিত্রের সুনির্ম্মলতা-প্রভাবে রাজাকেও ভয় করেন না, তাঁহার প্রধান মন্ত্রীকেই বা কেন তিনি গ্রাহ্য করিবেন? দেখ দেখ, উঁহার চক্ষুর দিকে তাকাইয়া দেখ, নির্ভীকতা-রূপ অগ্নির স্ফুলিঙ্গ কিরূপ বাহির হইতেছে!!! ইঁহার দৃষ্টি তৃণীকৃত-জগৎত্রয়-সত্বসারা রূপে প্রতিভাত হইতেছে! কান্তি-বাবুর দৃষ্টিতে যেমন কোমলতা, শ্রীনাথ বাবুরদৃষ্টিতে তেমনি প্রখরতা! অথচ দুইটী চিত্রই দর্শনীয়।

দৃশ্য—সপ্তবিংশ।

পরোপকারে আত্মবিস্মৃতি।

রাজপুর মিউনিসিপালিটীর অধীন কোনও গ্রামে এক যুবক বাস করিত। সে দারিদ্র্যে ক্লিষ্ট হইয়া কাজ কর্ম্মের জন্য আপিসে আপিসে ঘুরিয়া সন্ধান পাইল, তাহার উপযুক্ত একটী কাজ খালি হইয়াছে। যিনি এই কার্য্যে লোক লইবেন, তিনি হরিনাভিনিবাসী রাজকুমার ভট্টাচার্য্যের সহপাঠী। উভয়ে হেয়ার স্কুলে অধ্যয়ন করিতেন। রাজকুমার ছাত্রদিগের মধ্যে

সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিল বলিয়া তাহার সহপাঠিগণ সকলেই তাহাকে বড়ই ভাল বাসিত। যুবক এই সন্ধান পাইয়া রাজকুমারের নিকট উপস্থিত হইল এবং অর্থাভাবে স্ত্রীপুত্রদিগের কি দুর্দ্দশা হইতেছে, তাহা বর্ণনা করিতে করিতে কাঁদিয়া ফেলিল। রাজকুমারের কোমল প্রাণ অস্থির হইল। সে তখন জ্বররোগে শয্যাশায়ী থাকিলেও বলিয়া ফেলিল, "আচ্ছা আমি কল্যই আমার সহপাঠীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাহাতে তোমার ঐ কাজ হয় তাহা করিব।" দারিদ্র্য-পীড়িত যুবক অশেষ সান্ত্বনা পাইয়া সেই রাত্রিতে গৃহে ফিরিল এবং পরদিন প্রাতে রাজকুমারকে কলিকাতায় লইয়া যাইবার জন্য উপস্থিত হইয়া দেখিল, রাজকুমার জ্বরে কাঁপিতেছে, তাহার উত্থান-শক্তি নাই। যুবক কাতরস্বরে বলিতে লাগিল, "হা ভগবন্! এমন কপাল করিয়াছি যে, উপস্থিত অন্নেও ব্যাঘাত ঘটিল। আমি যে বড় আশা করিয়া আসিয়াছিলাম, আজ আমার দারিদ্র্য-ক্লেশের অবসান হইবে! হা ঠাকুর! তোমার মনে এই ছিল!"

রাজকুমার যুবকের ক্রন্দনে কাতর হইয়া বলিল, "ভাই, কাঁদিও না। আমি এই জ্বর গায়েই চাঙ্গড়িপোতা ষ্টেশনে হাঁটিয়া যাইতেছি। এক্ষণে গাড়ী পাল্কীর সম্ভাবনা না থাকিলেও এই এক মাইল পথ অনায়াসেই যাইতে পারিব। আমার পীড়ার ক্লেশ অপেক্ষা তোমার স্ত্রীপুত্রের অনাহার-ক্লেশ অনেক অধিক। এই আমি গায়ের লেপ ছাড়িতেছি; চল আমি তোমাকে কাজে বসাইয়া তবে ঘরে ফিরিব ও পথ্য করিব।"

এই কথা বলিতে বলিতে রাজকুমারের পীড়িত দেহে কোথা

হইতে, বল আসিয়া পড়িল। সে তখনি পাদ দ্বারা লেপখানি ছুড়িয়া ফেলিয়া দণ্ডায়মান হইল ও শুভ্রবস্ত্র পরিধান করিয়া যুবকের সহিত চাঙ্গড়িপোতা ষ্টেশনাভিমুখে চলিতে লাগিল। রাজকুমার যখন কাঁপিতে কাঁপিতে গমন করিতে লাগিল, তখন তাহার সেই দৃশ্য কি এক অদ্ভুত দৃশ্যরূপে প্রতিভাত হইতে লাগিল! এ দৃশ্য মর্ত্ত্যজগতে একেবারেই দুর্লভ। মর্ত্ত্যবাসিগণ স্বর্গ দেখিতে পায় না, কিন্তু সে দিন যাহারাই এই দৃশ্য দেখিয়াছিল, তাহারা স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছিল, "আজ আমরা স্বর্গ জিনিষটা কি, তাহা প্রত্যক্ষ দর্শন করিলাম!"

রাজকুমার যে দারিদ্র্যক্লিষ্ট যুবকের কার্য্যে সফলতা লাভ করিয়াছিল, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

দৃশ্য—অষ্টাবিংশ।

সন্তোষে শান্ত জ্ঞান।

একদিন একটী নব্য এম্, বি, ডাক্তার কলিকাতা কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটে একটী ডাক্তারখানায় বসিয়া সমুপাগত রোগীদিগের চিকিৎসা করিতেছে, এমন সময়ে একটী রোগী রোগের জ্বালায় অস্থির হইয়া উপশমার্থ উক্ত চিকিৎসকের নিকট উপস্থিত হইয়া কাতরভাবে বলিতে লাগিল, "ডাক্তার বাবু! আমি রোগের যাতনায় বড়ই কষ্ট পাইতেছি। আপনি আমার যাতনার উপশম করিয়া আমাকে রক্ষা করুন।"

চিকিৎসক মিষ্টবাক্যে তাহাকে প্রবোধ দিয়া, একটী ঔষধ তাহার দেহ ভেদ করিয়া প্রবিষ্ট করাইয়া দিল। শোণিতের সহিত ঔষধ সংস্পৃষ্ট হইবামাত্র রোগীর সমস্ত যাতনার উপশম

হইল। তখন উক্ত ব্যক্তি আনন্দে দুই হস্ত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে হাস্যমুখে গৃহের অভিমুখে প্রস্থান করিল। যে সকল ব্যক্তি চিকিৎসকের নিকট উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে তাঁহার এক পূজ্য ব্যক্তি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস! ঐ ব্যক্তির এত যাতনার উপশম হইল, কিন্তু কিছুই ত দিয়া গেল না! অন্ততঃ ঔষধের মূল্যটা দিয়া যাওয়া উচিত ছিল।"

চিকিৎসক হাসিতে হাসিতে বলিল, ঐ ব্যক্তি আমাকে যে যথেষ্ট দিয়া গেল!" পূর্ব্ব ব্যক্তি বলিলেন, "কৈ? আমরা ত বসিয়া দেখিতেছি, একটী পয়সাও দেয় নাই? ডাক্তার স্মিত-শোভিতবদনে বলিতে লাগিল, "আপনারা সকলেই দেখিতে পাইয়াছেন বৈ কি? ঐ যে হাসিটুকু মুখে দেখা দিল, উহার মূল্য অনেক টাকা। তদ্ভিন্ন দুই হাত তুলিয়া যে আশীর্ব্বাদ করিয়া গেল, তাহা একেবারেই অমূল্য। যাহাদের অর্থ নাই, তাহারা এই অমূল্য ধন দিয়া ডাক্তারদিগের সমস্ত পরিশ্রম সফল করিয়া যায়।"

নব্য চিকিৎসক যখন আনন্দবদনে এই কথা বলিতেছিল, তখন তাহার মুখে কি যে এক অপূর্ব্ব শোভা বিকাশিত হইতেছিল তাহা বর্ণনা করিবার সাধ্য নাই। সকলেই তন্ময় হইয়া নির্নিমেষ লোচনে এই স্বর্গীয় শোভা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা মনে মনে বলিতে লাগিলেন, 'বাঙ্গালা দেশে যে কতই রত্ন লোকের অজ্ঞাতসারে থাকিয়া দিন দিন বঙ্গের রত্নমালার ঔজ্জ্বল্য বর্দ্ধিত করিতেছে, তাহার সংখ্যা নাই!!'